জতুগৃহ

সুবোধ ঘোষ

শ্রালেখ্য পাবলিশার্স

নতুন সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীশঙ্কর কুমার দত্ত
শ্রীলেখা পাবলিশার্স
৯০এ, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅরুণ বোস

ব্লক ও মুদ্রণ :
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং প্রাঃ লিঃ
৪৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বাঁধাই :
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম : তিন টাকা মাত্র

জতুগৃহ

এত রাত্রে এটা কোন্ ট্রেন? এই শীতার্ত বাতাস, অন্ধকার আর ধোঁয়া ধোঁয়া বৃষ্টির মধ্যে যে ট্রেনটা ক্লান্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রাজপুর জংসনের প্লাটফর্মের গায়ে লাগ্‌লো?

খুব সম্ভব গঙ্গার ঘাটের দিক থেকেই ট্রেনটা এসেছে। এখনো অদূর গঙ্গার বুকে সেই স্টীমারের চিম্‌নি বাঁশির শব্দ শোনা যায়, যে স্টীমারটা একদল যাত্রীকে ঘাটে নামিয়ে দিয়ে একটু হাল্‌কা হয়ে আর হাঁপ ছেড়ে আবার ওপারে চলে যাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বয়টা একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। টেবিল চেয়ার বেঞ্চ আর আয়নাটার ওপর ঝট্‌পট্‌ তোয়ালে চালিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। জমাদার এসে রুমের টুকিটাকি আবর্জনা বড় বড় ঝাড়ুর টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ঘাটের ট্রেনটা ছোট হলেও এবং যাত্রীর সংখ্যা কম হ'লেও ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী দু'একজন তার মধ্যে পাওয়াই যায়। হয়তো কাটিহারের কোন চিনিকলের মহাজন, অথবা দার্জিলিং-ফেরত কোন চা-বাগানের সাহেব, এই ধরনের কুলীন শ্রেণীর যাত্রীও থাকেন, শুধু সাঁওতাল কুলির দলই নয়।

কিন্তু যাঁরা এই ক্লান্ত ট্রেন থেকে নেমে ব্যস্তভাবে এসে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিলেন, তাঁদের সঙ্গে চিনিকল অথবা চা-বাগানের কোন সম্পর্ক নেই।

কুলির মাথায় বাক্সবেডিং চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে তর্‌তর্‌ করে হেঁটে ওয়েটিং রুমে প্রথম এসে ঢুকলেন

এক বাঙালী মহিলা। গায়ে কাশ্মীরী পশমে তৈরী একটা মেয়েলী আল্স্টার, কানে ইহুদী প্যাটার্নের ছোট ফিরোজার দুল, খোঁপা বিলিতী ধাঁচে ফাঁপানো।

তার পরেই যিনি এসে ঢুকলেন, তাঁরও সঙ্গে কুলি, আর তেমনি বাক্স-বেডিংয়ের বহর। চোখে চশ্মা, গায়ে শাল, দেশী পরিচ্ছদে ভূষিত এক বাঙালী ভদ্রলোক।

এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা, একই ট্রেনের যাত্রী হয়ে এক ওয়েটিং রুমে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এই মাত্র সম্পর্ক, যদি নেহাৎই একে সম্পর্ক বলা যায়। ইনি হয়ত ঘণ্টা দু'য়েক আর উনি হয়তো ঘণ্টা তিনেক পথপ্রান্তের এই শিবিরে ট্রেনের প্রতীক্ষায় থাকবেন, তারপর চলে যাবেন যাঁর যাঁর পথে।

কিন্তু আশ্চর্য, ঘরে ঢোকা মাত্র দু'জনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে চম্‌কে ওঠেন, তারপরই চিত্রবৎ স্তব্ধ হয়ে থাকেন। দুজনেই যেন অপ্রস্তুত ও লজ্জিত, বিরক্ত ও বিড়ম্বিত, এবং একটু ভীতও হয়ে ওঠেন। যেন কাঠগড়া থেকে পালান ফেরারী আসামীর মত বহুদিন পরে এবং নতুন করে এক আদালত ঘরের মধ্যে দুজনে এসে পড়েছেন। মাধুরী রায়ের আল্স্টারে কুচি কুচি জলের ফোঁটা নিঃশব্দে চিক্‌চিক্ করে। শতদল দত্তও জলেভেজা চশ্মার কাচ মুছে নিতে ভুলে যায়।

এটা রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুম, আদালত ঘর নয়। জজ নেই, উকীল নেই, সাক্ষী নেই, সারি সারি সাজানো কতগুলি নিষ্পলক লোকচক্ষুও নেই। প্রশ্ন ক'রে লজ্জা দিতে, স্বীকৃতি বা স্বাক্ষর আদায় করতে তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। তবু এই নিভৃত সান্নিধ্যই দু'জনের কাছে বড় বেশী দুঃসহ ব'লে মনে হয়। সরে পড়তে পারলে ভাল, সরে যাওয়াই উচিত।

শতদল দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেয়—কুলি।

মাধুরীর জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে এই বেঞ্চের ওপর। শতদলের জিনিসপত্র স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে ঐ টেবিলটার ওপর।

এক্ষুনি জিনিসপত্র আবার কুলির মাথায় চাপিয়ে শতদল দত্তকে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়, তা সে জানে না। শুধু অদৃশ্য লজ্জায় অভিভূত এই ওয়েটিং রুম ছেড়ে অন্য কোনখানে, হয়তো ঐ মুসাফিরখানায়, যেখানে এ রকম আলো নেই, আসবাবও নেই, কিন্তু অতীতের এক অস্পষ্ট ছায়াকে এত জীবন্ত মূর্তিতে মুখোমুখি দেখে বিব্রত হওয়ার শঙ্কাও সেখানে নেই। শতদলের ডাকে সাড়া দিয়ে কুলিদের কেউ এল না, এল ওয়েটিং রুমের বয়।

—হুজুর।

বয়কে উত্তর দিতে হবে। শতদল দত্ত আর একবার দরজা পর্যন্ত পায়চারী ক'রে এগিয়ে যায়, বাইরে উঁকি দিয়ে তাকায়, গুঁড়ো বৃষ্টির একটা ঝাপ্‌টা মুখে এসে লাগে। ফিরে এসে আবার টেবিলটার পাশে দাঁড়ায়, যেন নিজেরই চিন্তার ভেতর পায়চারী ক'রে উত্তর সন্ধান করছে শতদল।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে থাকে শতদল, বোধ হয় এতক্ষণে নিজের মনের অবস্থাটার ওপরই রাগ ক'রে একটু শক্ত হয়ে উঠেছে। এভাবে বিচলিত হওয়ার কোন অর্থ নেই। ওয়েটিং রুমের মধ্যে মাত্র একজন যাত্রীকে দেখে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ, একটা অর্থহীন দুর্বলতার কাছে হার মেনে যাওয়া।

বয় বলে—ফরমাইস্‌ করুন হুজুর।

বেশ স্বচ্ছন্দভাবে শতদল দত্ত টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে, স্বচ্ছন্দস্বরে বয়কে নির্দেশ দেয়—চা নিয়ে এস।

আর ওদিকে, কাশ্মীরী পশমের আলস্টার গা থেকে নামিয়ে মাধুরী রায় বেঞ্চের ওপর রাখে। জিনিসপত্রগুলি সরিয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে বেঞ্চের ওপরই চুপ করে বসে থাকে।

শতদল দত্ত আর মাধুরী রায়। দু'জন ট্রেনযাত্রী মাত্র, খড়্গপুর জংশনের ওয়েটিংরুমে বসে থাকে ট্রেনের প্রতীক্ষায়। এ ছাড়া, দু'জনের মধ্যে আজ আর কোন সম্পর্ক নেই।

শুধু আজ নয়, আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার আগে ছিল, সেও প্রায় একটানা সাত বছর ধরে। সম্পর্কের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল প্রায় বার বছর অতীতে, যে অতীতে মাধুরী মিত্র নামে দেখতে-বড়-সুন্দর এক অনূঢ়া তরুণী শতদলের মেজবৌদির বান্ধবী মাত্র ছিল। আর স্থানটা ছিল ঘাটশিলা, সময়টা ফাল্গুন, মধুক্রমের বীথিকায় যখন সৌরভের উৎসব জাগে। তারই মধ্যে আকস্মিক এক অপরাহ্ণের আলোকে শুধু একটি বেড়াতে যাবার ঘটনা, সেই তো মাধুরী মিত্রের সঙ্গে শতদল দত্তের সম্পর্কের আরম্ভ।

এক বছরের পরিচয়েই দু'জনে দু'জনকে যে খুবই বেশি ভাল বেসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সে ভালবাসা আইন মত রেজিস্টারীও করা হয়, তার মধ্যেও কোন ভুল ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর সাতটি বছর পার হতে-না-হতেই মাধুরী দত্ত আর শতদল দত্তের মধ্যে সে ভালবাসার জোর আর রইল না। তাই আবার দু'জনেই স্বেচ্ছায় এবং আইন মত আদালতের শরণ নিল, রেজিস্টারী-করা সম্পর্ক বাতিল ক'রে দিয়ে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

কে জানে কেমন করে যেন দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, ভালবাসার জোর আর নেই। মনের দিক থেকে দু'জনে দু'জনেরই কাছে যখন পর হয়ে গেল তখন লোকচক্ষুর সম্মুখে অনর্থক আর থিয়েটারের স্বামী-স্ত্রীর মত দাম্পত্যের অভিনয় না ক'রে দু'জনেই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিল। কেউ কাউকে বাধা দিল না।

ফাল্গুনের ঘাটশিলায় মধুক্রমের সৌরভে যে প্রেমের আবির্ভাব, মাত্র সাতটি নতুন ফাল্গুনও তার গায়ে সহ্য হলো না। এত জোর

ভালবাসার পর বিয়ে, তবু বিয়ের পর ভালবাসার জোরটুকুই ভেঙে যায় কি ক'রে?

তাও দু'জনেই বাস্তব আর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেই বুঝেছিল। একদিন এই ঘরে বসে একমনে বই পড়ছিল মাধুরী, আর ওঘরে একা একা নিজের হাতেই কাপড়চোপড় গুছিয়ে বাক্সে ভরছিল শতদল। এক সপ্তাহের জন্য ভুবনেশ্বর গিয়ে থাকতে হবে, প্রত্নবিভাগের একটা সার্ভে তদারকের জন্য। শতদলের রওনা হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাধুরী একবার এসে চোখের দেখা দিয়েও যেতে পারলো না। সেদিনই মনে হয়েছিল শতদলের, এই যে পৌষের প্রভাতে জানালা দিয়ে এত আলো ঘরের ভেতরে এসে লুটিয়ে পড়েছে, নিতান্ত অর্থহীন, কোন প্রয়োজন ছিল না।

পৌষের সকাল বেলাটাই শুধু অন্যায় করেনি। সেই বছরেই চৈত্রের একটা রবিবারের বিকালবেলাও ভয়ানক এক বিদ্রূপ ক'রে দিয়ে চলে গেল। প্রতি রবিবারের মত সাজসজ্জা ক'রে বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল মাধুরী, এই ঘরে। আর পাশের ঘরেই গভীর মনোযোগ দিয়ে চালুক্য স্টাইলের মন্দিরভিত্তির একটা স্কেচ আঁকছিল শতদল। বেড়াতে যাবার কথা একটিবারের জন্যও তার মনে হলো না, কোন সাড়াও দিল না। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মাধুরীর শুধু মনে হয়েছিল, অস্তাচলের মেঘে এই ক্ষণিকের রক্তিমা নিতান্ত অর্থহীন, একটা অলক্ষুণে ইঙ্গিত, আর একটু পরেই তো অন্ধকারে সব কালো হয়ে যাবে। এই ছলনার খেলা আর না ক'রে সূর্যটা যদি একটু তাড়াতাড়ি ডুবে যায়, তবেই ভাল!

একে একে এইরকম আরও সব লক্ষণ দেখে দু'জনেই বুঝেছিল, ভালবাসা আর নেই। কিম্বা, ভালবাসা ছিল না বলেই এই সব লক্ষণগুলি একে একে দেখা দিচ্ছিল। কে জানে কোন্‌টা সত্য!

হয়তো, চেষ্টা করলে দু'জনেই জানতে পারতো, হয়তো জেনেছিল, হয়তো জানেনি। যাই হোক্, জানা-না-জানার ব্যাপারে কেউ কাউকে দোষ দিতে পারে না। হয় দু'জনেই জেনেশুনে চুপ করে ছিল, কিম্বা দু'জনে ইচ্ছে করেই জানতে চেষ্টা করেনি।

এ'ও হতে পারে, দু'জনেই নতুন করে আর গোপন ক'রে কোন নতুন জনের ভালবাসায় পড়েছিল। তাই মিথ্যে হয়ে গেল ঘাটশিলার পুরাতন ফাল্গুন। কিম্বা সে ফাল্গুন নিজেই সৌরভহীন হয়ে গিয়েছিল, তারই বেদনা দু'জনকে দুই দিকে নিয়ে চলে গেল। একজনকে একটি হেমন্তের সন্ধ্যায়, আর একজনকে একটি আষাঢ়ের পূর্ণিমায়। যাই হোক্ না কেন, দু'জনের মনে সেজন্য আর কোন ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না। হয় দু'জনেই ভুল করেছে, নয় দু'জনেই ঠিক করেছে। কেউ কাউকে দোষ দিতে পারে না।

কেউ কাউকে দোষ দেয়ওনি। ঘৃণা করেছিল, মার্জনা করতে পারেনি, দু'জনেই দু'জনকে। কিন্তু মনে মনে। যেদিন এই মনের বিদ্রোহ মনের মধ্যে পুষে রাখা দুঃসহ হয়ে উঠলো, সেদিন থেকেই সরে গেল দু'জনে। কেউ কাউকে অভিযোগ আর অপবাদের আঘাত না দিয়ে ভদ্রভাবে আদালতে আবেদন ক'রে সাত বছরের সম্পর্ক নিঃশেষে চুকিয়ে দিল।

ছাড়াছাড়ি হবার পর, বছর দেড়েক যেতে-না-যেতেই শতদল শুনেছিল, মাধুরী বিয়ে করেছে অনাদি রায় নামে এক এঞ্জিনিয়ারকে। মাধুরীও খবরের কাগজে পড়েছিল, অধ্যাপক শতদল দত্ত আবার বিয়ে করেছেন, নবজীবনসঙ্গিনীর নাম সুধাকণা, কলকাতারই একটা সেলাই স্কুলের টীচার।

এই নতুন দুটি বিয়েও নিশ্চয় দেখে-শুনে ভালবাসার বিয়ে। যে যাই বলুক, মাধুরী জানে অনাদি রায়কে স্বামীরূপে পেয়ে সে সুখী হয়েছে। বাইরে থেকে না জেনে শুনে যে যতই আজে-বাজে

মন্তব্য করুক না কেন, শতদলও জানে, সুধাকে পেয়ে সে সুখী হয়েছে।

তাই আজ রাজপুর জংশনের এই ওয়েটিং রুমে, এই শীতার্ত মাঝ-রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্তগুলির মধ্যে মাধুরী রায় আর শতদল দত্তের সম্পর্ক নিয়ে এ সব প্রশ্ন আর গবেষণা নিতান্ত অবান্তর ও নিষ্প্রয়োজন। সে ইতিহাস ভালভাবেই শেষ ক'রে দিয়ে ওরা দু'জনে একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে, কোন সম্পর্ক নেই।

অতীতের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা ছিল বর্তমানের।

এমন ক'রে একটা অযথা সময়ে পথের প্রতীক্ষা-ঘরে সেই দুটি জীবনেরই মুখোমুখি সান্নিধ্য দেখা দেয় কেন, যারা প্রতিদিন মুখো-মুখি হবার অধিকার আদালতের সাহায্যে পাঁচ বছর আগেই নিয়ম-বহির্ভূত করে দিয়েছে? এই আকস্মিক সাক্ষাৎ যেন একটা বিদ্রূপের ষড়যন্ত্র। যেমন অবৈধ তেমনি দুঃসহ। ঘটনাটাকে তাই যেন মন থেকে কেউ ক্ষমা করতে পারে না, অথচ আপত্তি বা প্রতিবাদ করারও কোন যুক্তি নেই। মাধুরা না হয়ে, আর শতদল না হয়ে, যদি অন্য কোন মহিলা যাত্রী ও পুরুষ যাত্রী এভাবে এই প্রতীক্ষা-গৃহে আশ্রয় নিত, এ ধরনের অস্বস্তি নিশ্চয় কারো হতো না। বরং স্বাভাবিকভাবে দু'একটা সাধারণ সৌজন্যের ভাষায় দুজনের পক্ষে আলাপ করাও সম্ভব হতো। কিন্তু মাধুরী রায় আর শতদল দত্ত, পরস্ত্রী আর পরপুরুষ, কোন সম্পর্ক নেই, তবু মনভরা সঙ্কোচ আর অস্বস্তি নিয়ে ওয়েটিং রুমের নিঃশব্দতার মধ্যে অসহায়ভাবে যেন বন্দী হয়ে বসে থাকে।

এই নীরবতার মধ্যে শতদল দত্তের ভারাক্রান্ত মন কখন্ যে ডুবে গিয়েছিল, তন্দ্রার মত একটা ক্লান্তিহরণ আরামে দুই চোখ বুঁজে গিয়েছিল, তা সে বুঝতে পারে নি। চোখ খুলে প্রথমেই বুঝতে পারে, এটা ওয়েটিং রুম। একটু দূরেই বেঞ্চের ওপর বসে রয়েছে

মাধুরী, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কৌতূহলহীন এবং নিষ্পলক এক জোড়া চোখের দৃষ্টি।

শতদল কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল না। তার দু'চোখে একটা লুকিয়ে দেখার কৌতূহল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কি এমন দেখবার আছে, আর, নতুন করেই-বা দেখবার কি আছে?

আছে। এমন মেঘ রঙের ক্রেপের শাড়ী তো কোন দিন পরেনি মাধুরী, এমন করে এত লম্বা আঁচলও মাধুরীকে কখনো লুটিয়ে দিতে দেখেনি শতদল। বেড়াতে যাবার সময় মাধুরীকে অবশ্যই পরতে হতো তাঁতের শাড়ী, ঢাকাই বা অন্য কিছু, চলতে গেলে যে শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে ফিস্‌ফিস করে অদ্ভুত এক শব্দের সুর শিহরিত হয়। আঁচলে অবশ্যই মাখতে হতো এক ফোঁটা হাস্‌না-হানার আরক। এইভাবে সুর ও সৌরভ হয়ে শতদলের পাশে চলতে হতো মাধুরীকে, নইলে শতদলের মন ভরতো না। সেই সুর আর সৌরভের কোন অবশেষ আজ আর নেই। মাধুরী বসে আছে এক নতুন শিল্পীর রুচি দিয়ে গড়া মূর্তির মত, নতুন রঙে আর সাজে। এমন ক'রে সন্তর্পণে অনধিকারীর অবৈধ লোভ নিয়ে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে কোন দিন মাধুরীকে দেখেনি শতদল। আজ দেখতে পায়, আর বুঝতে পারে, এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। একেবারে নতুন, আর বেশ একটু কঠিন, এঞ্জিনিয়ার অনাদি রায়ের স্ত্রী মাধুরী রায়।

অবান্তর চিন্তা আর অস্বস্তি থেকে মুক্তি পায় শতদল। বেশ স্বচ্ছন্দভাবে এবার নিজের প্রয়োজনের দিকে মন দেয়। ছোট একটা চামড়ার বাক্স খুলে তোয়ালে আর সাবান বের করে। হোল্ড-অল খুলে তার ভেতর থেকে একটা বালিস আর চাদর বের ক'রে অর্ধশয়ান লম্বা চেয়ারটার ওপর রাখে।

শতদলের দিকে তাকিয়ে দেখার কোন প্রয়োজন ছিল না মাধুরীর, সে তাকিয়ে ছিল আয়নায় প্রতিবিম্বিত শতদলের দিকে। ইচ্ছা ক'রে

নয়, আয়নাতে শতদলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, তাই। এবং ইচ্ছে না থাকলেও লুকিয়ে দেখার এই লোভটুকু সামলাতে পারেনি মাধুরী।

আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় মাধুরী, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করছে শতদল। হাতঘড়িটাকে খুলে নিয়ে একবার দম দিয়ে টেবিলের ওপর রাখে শতদল। মাধুরী বুঝতে পারে, এ ঘড়িটা সেই ঘড়ি নয়। ঘড়ির ব্যাণ্ডটাও কালো চামড়ার, যে কালো রং কোনোদিন পছন্দ করতো না মাধুরী। এবং মাধুরীর রুচির সম্মান রেখে শতদলও কোনদিন কালো ব্যাণ্ড পরতো না। আরও চোখে পড়ে, আংটিটা নতুন। বালিসের ঢাকাটার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে, রঙীন আর ফুল-তোলা। মাধুরীই তো জানে, সাদা প্লেন আর মোলায়েম কাপড়ের ঢাকা ছাড়া এসব রং-চং আর কাজ-করা জিনিস কোনদিন পছন্দ করতো না শতদল। বুঝতে পারে মাধুরী, সেলাই স্কুলের টীচার সুধা ভাল করেই সব বদ্‌লে দিয়েছে।

সাবান আর তোয়ালে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে গেল শতদল। আয়নার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার টেবিলের ওপরে শতদলের যত সংসারসামগ্রীর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে মাধুরী। এতক্ষণে যেন প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।

কিন্তু কি এমন বহুমূল্য নিদর্শন দেখার জন্য মাধুরীর দৃষ্টি টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত জিনিসপত্রের মধ্যে তল্লাসী করে ফিরছে, তা বোধ হয় সে নিজেই জানে না। অনেকক্ষণ ধরে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছুই দেখলো মাধুরী। সবই নতুন, পাঁচ বছর আগের কোন স্মৃতির চিহ্ন নেই। এমন কৌতূহল না হওয়াই উচিত ছিল।

এখন একবার আয়নার দিকে তাকালে দেখতে পেত মাধুরী, তুলির টানের মত আঁকা তার ভুরু দুটি যেন একটা ঈর্ষার স্পর্শে শিউরে সর্পিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আয়নার দিকে নয়, দৃষ্টি ছিল সোজাসুজি শতদলের জিনিসপত্রগুলির দিকে। তিন তিনটা বাক্স খোলা পড়ে

রয়েছে, ঘড়ি মনিব্যাগ ও চশমাটা টেবিলের ওপরেই, ছাই রঙের ফ্ল্যানেলের জামাটা ব্র্যাকেটে ঝুলছে, সোনার বোতামগুলো আলোয় চিক্ চিক্ করছে। নিঃসম্পর্কিতা এক মহিলার সম্মুখে সব ফেলে রেখে চলে গেছে ভদ্রলোক। চুরি হয়ে যেতে পারে, সে ভয় নেই। ভদ্রলোকের এই বিশ্বাসটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অস্বাভাবিক মাধুরীর আচরণ। এত সতর্কদৃষ্টি দিয়ে শতদলের জিনিসপত্র পাহারা দিতে তো কেউ তাকে বলেনি।

শতদল আবার ঘরে ঢুকতেই মাধুরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হোক্ না দর্পণের প্রতিচ্ছায়া, একটু স্পষ্ট করেই এবার দেখতে পায় মাধুরী, শতদল আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। সেলাই স্কুলের মাস্টারনীর এদিকে বিশেষ কিছু যত্ন নেই বলেই মনে হয়। হোক্ না পাঁচ বছরের অদেখা, আজও দেখে বুঝতে পারে মাধুরী, খুব ক্ষিদে না পেলে শতদলের মুখটা ঠিক এরকম শুক্‌নো দেখাতো না।

মাধুরীর অনুমান মিথ্যে নয়। শতদল একটা টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবারের বাটিগুলি বের করে টেবিলের ওপর রাখে। খেতে বসে। হাত তুলতে গিয়েই কি ভেবে হাত নামিয়ে নেয়। ঘরের কোণে রাখা জলের কুঁজোটার দিকে একটা গেলাস হাতে নিয়ে এগিয়ে যায়।

দৃশ্যটা মাধুরীর চোখে আঘাতের মত বেজে উঠবে, কল্পনা করতে পারেনি মাধুরী এবং তার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। হঠাৎ হয়ে গেল। আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সোজা শতদলের দিকে হঠাৎ ক্ষুব্ধ-ভাবে তাকায় মাধুরী। মাধুরীর এই চকিত গ্রীবাভঙ্গি, মৃদু ভ্রূকুটি আর চোখের কুপিতদৃষ্টি কিন্তু এতক্ষণের গম্ভীরতার চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক দেখায়।

মাধুরী বলে—ওকি হচ্ছে!

আকস্মিক প্রশ্নে শতদল একটু চমকে উঠেই মাধুরীর দিকে তাকায়।

মাধুরী আবার বলে—একটা মুখের কথা বললে এমন ভয়ানক দোষের কিছু হত না।

শতদলের গম্ভীর মুখ হঠাৎ স্মিত হয়ে ওঠে। হেসে হেসেই বলে—না, দোষ আর কি ?

মাধুরী উঠে দাঁড়ায় এবং এগিয়ে আসে। নিস্তব্ধ ওয়েটিং রুমের দুঃসহ মুহূর্তগুলির পেষণ থেকে যেন তার আত্মা এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছে। শতদলের স্বচ্ছন্দ হাসির শব্দে মাধুরীর ক্লিষ্ট মনের গাম্ভীর্যও ভেঙে গেছে শতদলের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে হাসিমুখে বলে তুমি বসো।

এটা ওয়েটিং রুম। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ি নয়, আর মাধুরীর জন্মদিনের উৎসবও আজ নয়, যেদিন উৎসবের সোরগোল থেকে শতদলকে এমনই একটি ঘরের নিভৃতে নিয়ে গিয়ে সেই যে জীবনে-প্রথম নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করে খাইয়েছিল মাধুরী।

কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে খাবারগুলো একটা ডিসের মধ্যে সাজিয়ে দিতে থাকে মাধুরী। কাঁচের গেলাসে আর মাধুরীর হাতের চুড়িতে অসাবধানে সংঘাত লাগে, শব্দ হয়, পাঁচ বছর আগের নিস্তব্ধ অতীত সে নিক্কণে যেন চমকে জেগে ওঠে। দুই ট্রেনযাত্রী নয়, দেখে মনে হবে, ওরা এই সংসারেরই দুটি সহজীবনযাত্রী ; আর, সে জীবনযাত্রায় কোন খুঁত আছে বলে তো মনে হয় না। মাধুরীর হাতের আঙ্গুলগুলি দেখতে যদিও একটু রোগা রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু খাবারগুলোকে সেই রকমই আলগোছে যেন চিমটি দিয়ে তোলে, সেই পুরনো অভ্যাস। শতদলের পাশেই প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, নিস্তব্ধ ঘরে মাধুরীর ছোট ছোট নিঃশ্বাসের শব্দ মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট করে শোনা যায়। আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে গিয়ে শতদলের একটা হাতের ওপর লুটিয়ে

পড়েছে। লক্ষ্য করে না মাধুরী। এমন বিসদৃশ বা অপার্থিব কিছু নয় যে লক্ষ্য করতেই হবে।

—সবই দেখছি বাজারের তৈরী খাবার।

মাধুরীর কথার মধ্যে একটা আপত্তির আভাস ছিল, যার অর্থ বুঝতে দেরী হয় না শতদলের। বাজারের তৈরী খাবারের বিরুদ্ধে মাধুরীর মনে যে চিরন্তন বিদ্রোহ আছে, তা শতদলের অজানা নয়। তাই যেন দোষ স্খালনের মত সুরে সঙ্কুচিতভাবে বলে—হ্যাঁ, কাটিহার বাজারে ওগুলি কিনেছিলাম।

মাধুরী—যাচ্ছ কোথায়?

শতদল—কলকাতায়।

মাধুরী—তুমি কি এখন কলকাতাতেই···।

শতদল—হ্যাঁ।······তুমি?

এ কথাগুলি না উঠলেই বোধ হয় ভাল ছিল। হাত কাঁপে, কাজের স্বাচ্ছন্দ্য হারায় মাধুরী। শতদলের প্রশ্নে যেন নিজের পরিচয় হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মাধুরীর। কুণ্ঠিতভাবে একটু তফাতে সরে গিয়ে মৃদু স্বরে মাধুরী উত্তর দেয়—রাজগীর।

এই পর্যন্ত এসেই প্রসঙ্গ ফুরিয়ে যায়। আর প্রশ্ন করে জানবার মত কিছু নেই। একজন কলকাতা, আর একজন রাজগীর। দু'জন দুই ট্রেনযাত্রী মাত্র। এক ট্রেন নয়, এক লাইনের ট্রেনও নয়। তবু মনের ভুলে দুজনে যেন বড় কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। যা নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত, তাই দিয়ে দুজনে যেন কিছুক্ষণের মত বড় শোভন ও সঙ্গত হয়ে উঠেছিল।

হয়তো কোন প্রসঙ্গ না পেয়েই শতদল বলে—তোমাকে তাহ'লে বোধ হয় পাটনার ট্রেন ধরতে হবে?

—হ্যাঁ। তুমি খেয়ে নাও।

এক নিঃশ্বাসে যেন জোর করে কোনমতে কথাগুলি উচ্চারণ করেই

মাধুরী সরে যায়। সত্যিই তো, পাটনার ট্রেনেই তাকে চলে যেতে হবে, চিরকালের মত এখানে বসে থাকবার জন্য সে আসেনি। নিজের হাত ঘড়িটার দিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকায় মাধুরী; তারপর আবার আগের মতই বেঞ্চটার ওপর গিয়ে বসে থাকে।

খাবারগুলো শতদলের সম্মুখে সাজানো, কাঁচের গেলাসের গায়ে বিদ্যুতের বাতিটার আলো ঝল্‌কায়, জলটাকে তরল আগুনের মত মনে হয়। আবার বোধ হয় অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়েছে শতদল। কিন্তু বড় শ্লেষ, বড় জ্বালা আছে এ লজ্জায়। সব জেনেশুনেও হঠাৎ লোভের ভুলে এক প্রহেলিকার মায়াকে কেন সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল শতদল ?

ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শতদল, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে লম্বা চেয়ারের ওপর শুয়ে পড়ে, সিগারেট ধরায়।

খাবার খেতে পারল না শতদল। কিন্তু কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর আজ নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টাও করে না শতদল।

ওয়েটিং রুম আবার ওয়েটিং রুম হয়ে ওঠে। দুই সম্পর্কহীন অনাত্মীয়, ভিন্ন ভিন্ন ট্রেনের দুই যাত্রী প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুন্‌ছে। কিন্তু ট্রেনও আসে না, তৃতীয় কোন যাত্রীও এসে এ ঘরে প্রবেশ করে না। আসে বয়, হাতে একটি ট্রে, তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। একটি টি-পট, একটি দুধের জার, একটি চিনির পাত্র, কিন্তু পেয়ালা দুটি।

টেবিলের ওপর ট্রে-সমেত চায়ের সরঞ্জাম রেখে বয় চলে যায়। তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি তুলে চায়ের পাত্রের দিকে একবার তাকায় শতদল, কিন্তু পরমুহূর্তে যেন একটা বাধা পেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

ট্রের ওপর দুটি চায়ের পেয়ালা। কি ভয়ানক বিদ্রূপ! কোন্ বুদ্ধিতে বয়টা দুটি পেয়ালা দিয়ে গেল কে জানে ? সেরকম কোন নির্দেশ বয়কে তো দেয়নি শতদল।

চা-খাওয়াও আর সম্ভব হলো না।

সোজাসুজি তাকিয়ে না দেখুক, মাধুরী যেন মনের চোখ দিয়ে স্পষ্ট করেই দেখতে পাচ্ছে, খাবার স্পর্শ করছে না শতদল, চা'ও বোধ হয় খাবে না। বয়টা এক নম্বরের মুখ্যু, চা'টা যদি ঢেলে দিয়ে যেত, তবে ভদ্রলোক বোধ হয় এরকম কুণ্ঠিত হয়ে বসে থাকতেন না। কিন্তু এত কুণ্ঠাই বা কেন? এ তো আর মধুপুর নয়, সেজমামার বাসা নয়, আর সেই বড়দিনের ছুটির দিনটাও নয়।

বড়দিনের ছুটিতে মধুপুরে সেজমামার ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল শতদল আর মাধুরী। প্রথম দিনেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, অনেকটা এইরকমই নিঃশব্দ প্রতিবাদের মত চা না খেয়ে সারা সকালটা বাগানের একটা ঝাউয়ের নীচে চেয়ার টেনে বসে রইল শতদল। প্রতিবাদের কারণ, বাড়িতে এত লোক থাকতে, আর সবার ওপর মাধুরী থাকতেও শতদলকে চা দিয়ে গেল বাড়ির চাকর! রহস্যটা যখন ধরা পড়লো, বাড়িসুদ্ধ লোক লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশী বকুনি খেল মাধুরী। মামীমা বকলেন, সেজমামা বকলেন, এমনকি স্বল্পভাষী বড়দাও বললেন—যখন জানিস যে, তুই নিজের হাতে চা না এনে দিলে শতদল অসন্তুষ্ট হয়, তখন……।

কিন্তু এটা ওয়েটিং রুম, সেজমামার বাসা নয়। অভিমানী স্বামীর মত এমন মুখ ঘুরিয়ে এভাবে পড়ে থাকা আজ আর শতদলকে একটুও মানায় না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এই বিসদৃশ অভিমানের আবেদন ওয়েটিং রুমের অন্তর যেন স্পর্শ করে। রঙ্গ-মঞ্চের একটি নাটকাঙ্কের দৃশ্যের মত কৃত্রিম হয়েও ঘটনাটা সত্যি সত্যি মান-অভিমানের দাবী নিয়ে যেন প্রাণময় হয়ে ওঠে। মাধুরীকে এখানে ধমক দিয়ে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার কেউ নেই, তবু নিজের মনের গভীরেই কান পেতে শুনতে পায়, কেউ যেন তাকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

—খাবার খাচ্ছ না কেন ?

বড় কোমল ও মৃদু অনুনয়ের সুর ছিল মাধুরীর কথায়।

শতদল শান্তভাবেই উত্তর দেয়—না, এত রাত্রে এসব আর খাব না।

—তবে শুধু চা খাও।

—হ্যাঁ, চা অবশ্য খেতে পারি।...তুমি খাবে না ?

মাধুরীর মুখে হাসির ছায়া পড়ে।—আমার কি চা খাবার কথা ছিল ?

শতদল লজ্জিতভাবে হাসে—তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু বয়টা যখন ভুল করে দুটো পেয়ালা দিয়েই গেছে, তখন......।

—তখন এক পেয়ালা চা আমার খাওয়াই উচিত, এই তো ?

মাধুরীর কথার মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা জড়তা ছিল না। হেসে হেসেই কথাগুলি বলতে পারে মাধুরী।

শতদল বলে—আমি তো তাই মনে করি। বয়টার আর কি দোষ বল ?

মাধুরী—না, বয়কে আর দোষ দিয়ে লাভ কি ?

দু'জনেই ক্ষাণকের মত গম্ভীর হয়। সত্যিই তো, বয়কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মাধুরীর কথাগুলির মধ্যে কেমন একটা আক্ষেপের সুর যেন মিশে আছে। বোধ হয় বলতে চায় মাধুরী, বয়টার দোষ হবে কেন, দোষ অদৃষ্টের, নইলে আজ পাঁচ বছর পরে এমন একটা বিশ্রী রাত্রিতে একটা ওয়েটিং রুমের চক্রান্তে পড়ে কেন এভাবে অপ্রস্তুত হতে হবে ?

হয় আর চুপ করে বসে থাকার শক্তি ছিল না, নয় ইচ্ছে করেই এই ওয়েটিং রুমের চক্রান্তে আত্মসমর্পণ করতে চায় মাধুরী। উঠে দাঁড়ায়, টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে, চা তৈরী করে। সেই হাতে, সেই নিপুণতা দিয়ে, স্বচ্ছন্দে ও সাগ্রহে।

শতদলও ওঠে, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এসে টেবিলের কাছে

নিজের চেয়ারের পাশে রাখে। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে—বসো।

মাধুরী আপত্তি করে না। আপত্তি করার মত জেদগুলিকে আর মনের মধ্যে খুঁজে পায় না। রাজপুর জংসনের ওয়েটিং রুম দুই অনাত্মীয় নরনারীর মনের ভুলে ধীরে ধীরে দম্পতির নিভৃত নীড়ের মত আবেগময় হয়ে উঠছে, বুঝতে পারলেও কেউ আর ঘটনাকে বাধা দিতে চায় না। শতদলের পাশের চেয়ারে ব'সে পড়ে মাধুরী।

চায়ে চুমুক দিয়েই একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে শতদল। শুধু চায়ের আস্বাদ পেয়ে নিশ্চয় নয়, চায়ের সঙ্গে মাধুরীর হাতের স্পর্শ মিশেছে, তৃষ্ণা মিটে যাবারই কথা।

শতদল হাসিমুখে বলে—তোমার গম্ভীর ভাব দেখে সত্যিই এতক্ষণ বড় অস্বস্তি হচ্ছিল।

মাধুরীও হাসে—তোমার তো অস্বাস্ত হচ্ছিল, কিন্তু আমার যা হচ্ছিল তা আমিই জানি।

শতদল—ভয় করছিল বুঝি ?

মাধুরী মাথা হেঁট করে—হ্যাঁ।

শতদল—ছি, ভয় করবার কি আছে ?

হাসতে হাসতে আলাপটা শুরু হয়েও শেষদিকে কথাগুলি কেমন একটা করুণতার ভারে বিনমিত হয়ে ওঠে। মাধুরীর কথাগুলি বেদনাময় স্বীকৃতির মত, শতদলের কথায় আশ্বাসের নিবিড়তা। সে অতীত অতীত হয়েই গেছে, আজ আর ভয় করবার কি আছে ?

মানুষ মরে যাবার পর যেমন তার বিষয় মমতা দিয়ে বিচার করা সহজ হয়ে ওঠে, আর ভুলগুলি ভুলে গিয়ে গুণগুলিকে বড় করে ভাবতে ইচ্ছে করে, শতদল আর মাধুরী বোধহয় তেমনি করেই আজ তাদের মৃত অতীতকে মমতা দিয়ে বিচার করতে পারছে। অতীতের সেই ভয় ঘৃণা ও সংশয়ের ইতিহাস যেন নিজেরই জ্বালায় ভস্ম হয়ে সংসারের বাতাসে হারিয়ে গেছে চিরতরে। আজ শুধু মনে হয়, সেই

অতীত যেন সাত্ত বছরের একটি রাত্রির আকাশ, তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল ছোট বড় কত তারা, কত মধুর ও স্নিগ্ধ তার আভা। সে আকাশ একেবারে হারিয়ে গেছে, ভাবতে কষ্ট হয়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, ফিরে পেতে ইচ্ছে করে বৈকি।

শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলে—তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

শতদল—নিজে কি হয়েছ?

চায়ের পেয়ালাটা হাতে ধরে রেখেছিল মাধুরী। সেই দিকে তাকিয়ে শতদল অনুযোগের সুরে বলে—আঙুলগুলোর এ দশা হয়েছে কেন?

মাধুরী—কি হয়েছে?

শতদল—কি বিশ্রী রকমের সরু সরু হয়ে গেছে।

মাধুরী লজ্জিতভাবে হাসে, আঁচলের আড়ালে হাতটা লুকিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু শতদল যেন এক দুঃসহ লোভের ভুলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মাধুরীর হাতটা টেনে নিয়ে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে। মাধুরী আপত্তি করে না।

এ বড় অদ্ভুত! সাত বছরের যে জীবন-কুঞ্জ একেবারে বাতিল হয়ে গেছে, আজ এতদিন পরে দেখা যায়, বাতিল হয়ে গেছে তার কাঁটাগুলি, বাতিল হয়নি তার ছায়া।

একটা অজানা সত্য যেন আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে শতদল; মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।—তোমার মুখটি কিন্তু সেই রকমই আছে মাধুরী, একটুও বদলায়নি।

বদলে গেছে সব, শুধু সেই মুখটি বদলায়নি। বাতিল হয়ে গেছে সব, শুধু সেই ভালবাসার মুখটি বাতিল হয়ে যায়নি। এও কি সম্ভব? হয় চোখের ছলনা, নয় কল্পনার বিভ্রম।

সব ছলনা ও বিভ্রমকে মিথ্যে করে দিয়ে মাধুরীর সারা মুখে নিবিড়

এক লজ্জার ছায়া রক্তাভ হয়ে ওঠে। প্রথম ভালবাসার সম্ভাষণে চঞ্চলিতচিত অনূঢ়া মেয়ের মুখের মত নয়, বাসরকক্ষে প্রথম পরিচিতা ব্রীড়ানত বধূর মুখের মত নয়, দীর্ঘ অদর্শনের পর স্বামীর সম্মুখে সমাদরধন্য নারীর মুখের মতই।

প্রণয়কুঞ্জ নয়, বাসরকক্ষ নয়, দম্পতির গৃহনিভৃত নয়, রাজপুর জংসনের ওয়েটিং রুম। তবু শতদল আর মাধুরী, দুই ট্রেনযাত্রী বসে থাকে পাশাপাশি, যেন এইভাবেই তারা চিরকালের সংসারে সহযাত্রী হয়ে আছে, কোনদিন বিচ্ছিন্ন হয় নি।

চা খাওয়া শেষ হয়। মাধুরী জিজ্ঞাসা করে—কাকাবাবু এখন কোথায় আছেন?

শতদল—তিনি দেরাদুনে বাড়ি করেছেন, এখন সেখানেই আছেন।

মাধুরী— পুঁটি?

শতদল—পুঁটির বিয়ে হয়ে গেছে, সেই রমেশের সঙ্গে। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে ভালই একটা চাকরি পেয়েছে রমেশ।

মাধুরীর হাতটা বড় শক্ত করে ধরেছিল শতদল। যেন পাঁচ বছর অতীতের এক পলাতক মায়াকে অনেক সন্ধানের পর এতদিনে কাছে পেয়েছে। দু'হাত দিয়ে ধরে রেখেছে তার একটি হাত, যেন আবার হারিয়ে না যায়।

—তুমি বিশ্বাস কর মাধুরী?

—কি?

—তোমাকে আমি ভুলিনি, ভুলতে পারা যায় না।

—বিশ্বাস না করার কি আছে, চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

—কিন্তু তুমি?

—কি?

—তুমি ভুলতে পেরেছ আমাকে?

দু'চোখ বন্ধ করে মাধুরী, যেন চারদিকের বাস্তব সংসারের লোক-

চক্ষুগুলিকে অন্ধ ক'রে দিয়ে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। মাথাটা শতদলের বুকের কাছে একটু ঝুঁকে পড়ে, দু'চোখের কোণে ছোট ছোট মুক্তা-কণিকার মত দুটি সজলতার বিন্দু জেগে ওঠে।

দু'হাতে জড়িয়ে মাধুরীর মাথাটা বুকের ওপর টেনে নেয় শতদল—বলতেই হবে মাধুরী, আমি না শুনে ছাড়বো না।

হঠাৎ ছটফট করে ওঠে মাধুরী, যেন মাধুরীকে একটা আগুনের জ্বালা হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। শতদলের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাইরে শীতার্ত রাত্রির স্তব্ধতা চমকে দিয়ে প্রবল শব্দে লোহার ঘণ্টা বাজছিল ঝন্‌ঝন্‌ করে। ঘরের ভেতর আয়নাটাও কাঁপছিল। যেন দুটি জীবনের এই দুঃসাহসের ব্যভিচার সইতে না পেরে ওয়েটিং রুমটাই আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। ধুলিয়ান আপ প্যাসেঞ্জার এসে পড়েছে, ছুটাছুটির সাড়া পড়ে গেছে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

—এই ট্রেনেই তো ওর আসবার কথা!

উদ্‌ভ্রান্তের মত কথাগুলি বলতে বলতে দরজার দিকে ছুটে যায় মাধুরী।

তৃতীয় যাত্রী এসে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করে। মাধুরীকে দেখতে পেয়েই তার সারা মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে, যেন এই অমাবৃত রাত্রির পথে এক নিঃসঙ্গ পথিক এতক্ষণ পরে পান্থশালার আলোক দেখতে পেয়েছে, মাধুরী রায়ের স্বামী অনাদি রায়।

মাধুরীর মুখও পুলকিত হয়ে উঠেছে দেখা যায়, কিন্তু তখনো যেন একটু বিষন্নতার স্পর্শ লেগেছিল, ক্লান্ত প্রদীপের আলোকে যেমন একটু ধোঁয়ার ভাব থাকে।

অনাদি রায় কিন্তু তা'তেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। মাধুরীর কাছে এগিয়ে এসে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন—শরীর-টরীর ভাল বোধ করছো তো?

—হ্যাঁ, ভালই আছি।

—অনেকক্ষণ ধরে একা একা বসে থাকতে হয়েছে, না?

—হ্যাঁ।

—কি করবো বল? ট্রেনগুলো যে রকম বে-টাইমে চল্‌ছে, নইলে দু'ঘণ্টা আগেই পৌঁছে যেতাম।

অনাদি রায় উৎসাহের সঙ্গে একটা বেডিং খুলতে আরম্ভ করলেন। মাধুরী আপত্তি করে—থাক্, ওসব খোলামেলা করে লাভ নেই।

—তুমি একটু শুয়ে নাও মাধুরী, রেস্ট পেলে শরীর ভাল বোধ করবে।

—থাক্, আর কতক্ষণই বা।

অনাদি রায় কিন্তু নিরুৎসাহিত হলেন না। বাক্স খুলে একটা মির্জাপুরী আলোয়ান বের করলেন। দু'ভাঁজ করে নিজের হাতেই আলোয়ানটা মাধুরীর গায়ে পরিপাটি ক'রে জড়িয়ে দিলেন।

এতক্ষণ চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে দেখছিল শতদল। একটা প্রহসনের দৃশ্য, নির্মম ও অশোভন। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকা আর সম্ভব হলো না। একবার ব্যস্ত হয়ে উঠে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে। ফিরে এসে জিনিসপত্রগুলি একবার অকারণ টানাটানি করে। যেন একটা শাস্তির কারাগারে বন্দী হয়ে শতদলের অন্তরাত্মা ছটফট্ করছে। যেন পৃথিবী হাত্‌ড়ে একটু সুস্থির হবার মত ঠাঁই, অথবা পালিয়ে যাবার পথ খুঁজতে থাকে শতদল।

দৃশ্যটা সত্যিই সহ্য হয় না। মির্জাপুরী আলোয়ান যেন মাধুরীর পথশ্রমক্লান্ত আত্মাকে শত অনুরাগে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। অনাদি রায় নামে এই সজ্জন, কী গরবে গরীয়ান হয়ে বসে আছেন হাসি মুখে। আর ঐ মাধুরী, যেন পৌরাণিক কিংবদন্তীর এক নারী, স্বয়ংবরার অভিনয় মাত্র করে, কিন্তু বরমাল্য দান করে তারি গলায় যে তাকে লুঠ ক'রে রথে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারে। এক ভগ্নবাহু প্রতিদ্বন্দ্বীর মত

সকল পরাভবের দীনতা নিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে শতদল। সহ্য করতে কষ্ট হয়।

চলে গেলেই তো হয়, কেন বসে বসে এত জ্বালা সহ্য করে শতদল?

যেতে পারে না একটি লোভের জন্য। মাধুরীর কাছ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরটা শুনে যাবার লোভ। মাধুরী তাকে ভুলতে পারেনি, মাত্র এইটুকু সত্য মাধুরীর মুখ থেকে শুনে যেতে পারলেই জয়ীর আনন্দ নিয়ে চলে যেতে পারবে শতদল।

কিন্তু ইহজীবনে এই উত্তর শুনে যাবার কোন সুযোগ আর হবে কি।

অনাদি রায় ঘড়ি দেখলেন, বোধ হয় ট্রেনের টাইম হয়ে এসেছে। মাধুরী তার আলস্টার তুলে নিয়ে গায়ে দিল। কুলিও পৌঁছে গেল, পাটনার ট্রেন আসছে।

স্বামীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। কুলিরা চটপট্ জিনিস-পত্রগুলি মাথায় চাপিয়ে দাঁড়ালো! রাজপুর জংসনের ওয়েটিং রুমকে শূন্য করে দিয়ে ওরা এখনই চলে যাবে। শতদলের মনে হয়, মাধুরী যেন যাবার আগে এক জতুগৃহের গায়ে আগুনের জ্বালা লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ছে।

সাত বছরের আকাশ কি নিতান্ত মিথ্যা? তাকে কি ভুলতে পারা যায়? ছিন্ন করে দিলেই কি ভিন্ন করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর আর দিয়ে যাবে না মাধুরী, উত্তর দেবার আর কোন সুযোগও নেই।

কোন দিকে না তাকিয়ে শুধু স্বামীর সঙ্গে হাসতে হাসতে এই ঘরের দুয়ার পার হয়ে চলে গেলেই ভাল ছিল, কিন্তু ঠিক সেভাবে চলে যেতে পারলো না মাধুরী! কুলিরা চলে গেল, অনাদি রায়ও চলে গেলেন, কিন্তু দরজার কাছ পর্যন্ত এসেই মাধুরী যেন চরম অন্তর্ধানের আগে এই জতুগৃহের জন্যই একটা অলীক মমতার টানে

একবার দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে শতদলের দিকে তাকায়। হাসি-মুখেই বিদায় চায়—যাই।

শতদল হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারে না। অনেকগুলি অভিমান আর দাবী একসঙ্গে এলোমেলোভাবে তার কথায় ফুটে উঠতে চাইছে। কিন্তু এত কথা বলার সময় আর কই? শুধু সেই একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে চরম জানা জেনে নিতে চায় শতদল।

—যাচ্ছ, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিয়ে গেলে না মাধুরী।

হাসি মুছে যায়, বিস্মিতভাবে তাকিয়ে মাধুরী প্রশ্ন করে—কিসের প্রশ্ন?

শতদল বলে—সত্যি ভুলে গেছ?

উত্তর দেয় না মাধুরী। ভুলেই গেছে বোধ হয়। সাত বছরের ইতিহাস ভুলতে পারেনি যে মাধুরী, সাত মিনিট আগের কথা সে কি ভুলে গেল? এরই মধ্যে বিশ্বসংসারের নিয়মগুলি কি এমনই উল্টে গেল যে, সব ভুলে যেতে হবে! বুঝতে পারে না শতদল।

মাধুরী বলে—যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

শতদলের সব কৌতূহলের লোভ যেন একটা রূঢ় আঘাতে ভেঙে যায়। এতক্ষণে মনে পড়ে, মাধুরীর যে একটি পরম গন্তব্য আছে, আর দেরী করতে পারে না। সাত বছর দেরী করিয়ে দিয়েছে শতদল, এখন আর এক মূহূর্তও মাধুরীকে দেরী করিয়ে দেবার কোন অধিকার নেই।

শতদল বিমর্ষভাবে বলে—বুঝেছি, তুমি উত্তর দেবে না।

মাধুরী শান্তভাবে বলে—উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

শতদল—কেন?

মাধুরী—বড় অন্যায় প্রশ্ন।

—বুঝেছি! ছটফট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শতদল। তার অন্তরাত্মাই যেন কিসের মোহে অবুঝ হয়ে আছে, যার জন্যে বার

বার শুধু বুঝতে হচ্ছে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে শতদল এক নিঃশ্বাসে এবং একটু রূঢ়ভাবেই বলে—যাও, কিন্তু এরকম একটা তামাশা ক'রে যাবার কোন দরকার ছিল না।

বড় তিক্ত শতদলের কথাগুলি। মুহূর্তের মধ্যে মাধুরীর মুখটাও কঠিন হয়ে ওঠে, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। চুপ ক'রে কি যেন ভেবে নেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে আগের মতই আবার হাস্যময় হয়ে ওঠে। বোধ হয় সেই অলীক মমতার টানেই এই জতুগৃহকে যাবার আগে জ্বালিয়ে দিয়ে নয়, একটু বুঝিয়ে দিয়ে আর হাসিয়ে দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মাধুরী।

হাতঘড়ির দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে মাধুরী বলে—একবার সুধাকে নিয়ে রাজগীরে বেড়াতে এস।

শতদল অপ্রস্তুতভাবে তাকায়—তার পর?

—তারপর তোমরা দু'জনে যেদিন বিদায় নেবে, আমি এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব।

—কেন?

—আমাকে একটা তামাশা দেখাবার সুযোগ তোমরাও পাবে, এই মাত্র।

—তাতে তোমার লাভ?

মাধুরী হেসে ফেলে—লাভ কিছু নয়, তোমার মতই হয়তো এই রকম মিছিমিছি রাগ করে কতগুলি বাজে কথা বল্‌বো।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে শতদল। তার পরেই ব'লে ওঠে—বুঝলাম।

কথাটা বেশ জোরে উচ্চারণ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ফেলে শতদল। বাজে কথার অভিমান আর দাবীগুলি যেন নিজের স্বরূপ চিনতে পেরে অট্টহাস্য করে উঠেছে। এতক্ষণে সত্যিই বুঝতে পেরেছে শতদল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে থাকে এবং দরজার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে শতদল, মাধুরী চলে গেল।

জতুগৃহে আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাগলো না, লাগলো উচ্চহাসির প্রতিধ্বনি। রাজপুর জংশনের যেন সুপ্তি ভেঙ্গে গেল। আর একটি আগন্তুক ট্রেনের সঙ্কেতধ্বনিও বাজে। কলকাতার ট্রেনও এসে পড়েছে। এদিকের প্ল্যাটফর্মে নয়, উল্টো দিকে। কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে শতদল দত্তও ব্যস্তভাবে চলে যায়।

দু'দিকের ট্রেন দু'দিকে চলে যাবে। রাজপুর জংসনের শেষরাত্রি ক্ষণিক কলরবের পর নীরব হয়ে যাবে। এরই মধ্যে এক প্রতীক্ষা গৃহের নিভৃতে দুই ট্রেন যাত্রীর সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে কি যে পরীক্ষা হয়ে গেল, তার সাক্ষ্য আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু এখনও আছে, যদিও দেখে কিছু বোঝা যায় না।

ওয়েটিং রুমের টেবিলের ওপর একটি ট্রে, তার ওপর পাশাপাশি দুটি শূন্য চায়ের পেয়ালা। কোথা থেকে কারা দু'জন এসে, আর পাশাপাশি বসে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। রাজপুর জংসন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বয় এসে তুলে নিয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখে দেবে, একটা পেয়ালা কাবার্ডের এই দিকে, আর একটা হয়তো একেবারে ঐ দিকে।

মানশুল্কা

ট্রাফিকের বড় সাহেব মাঝে মাঝে তাঁর শিকার-করা বাঘের শবটাকে স্টেশনের মুসাফিরখানায় শুইয়ে রাখতেন, আর দর্শকের সমাগমে নিরেট একটা ভিড় লেগে থাকতো সমস্তদিন। আজকেও একটা ভিড় লেগেছে--অনেকটা সেই রকমের ভিড়। লোক ছুটে আসছে একটা গুলি ক'রে মারা বাঘ দেখবার তীব্র কৌতূহল নিয়ে। স্কুলের ছাত্রেরা সাইকেল চালিয়ে এসে সজোরে ব্রেক কষে থামছে, সাইকেলগুলিকে সশব্দে রেলিংয়ের ওপর ঠেলে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে মাথা ঢোকাচ্ছে। ভেলকিওয়ালার ডুগডুগি বাজলে পাড়ার ছোট ছেলেপিলেরা যেমন দুরন্ত এক প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে—বরাচক স্টেশনের মুসাফিরখানায় তেমনি ভদ্র-ভদ্রেতর ছেলে-বুড়ো সবাই প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আসছে। তর সইছিল না কারও।

কয়েকজন কুলিও ওজন-কলটার ওপর বসে এই দৃশ্য দেখছিল। আপ-ডাউন ট্রেনগুলি এসে আবার চলে গেছে, তবু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এক অপার্থিব আমোদের পুলকে রোজগারের তাড়নাও ভুলে গেছে তারা।

দর্শকদের দৃষ্টি যেন লালায়িত হয়ে চকচক করছিল। ভিড়ের মাঝখানে বসেছিল তিনজন কনেস্টবল, মাঝে মাঝে জনতার উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে মৃদু ধমকও হাঁকছিল। কিন্তু তাদেরও হাবভাব একটা কৃতিত্বের ভারিক্কি দেমাকে ভরে উঠেছিল, যেন কি ভয়ানক এক কীর্তিকে তারা লাগাম বাগিয়ে ধরে রেখেছে।

কনেস্টবলদের কাছে বসেছিল একটা মেয়ে, ঠিক কোন্ জাতের তা বোঝা যায় না। বোধ হয় কোন জংলী জাত। বছর কুড়ি বয়স হবে। একটা নতুন থান কাপড় পরে বসে আছে মেয়েটা। থানার

দারোগা দিয়েছেন এই কাপড়, কারণ ওর কাপড়-চোপড় দু'দিন আগেই এক কলঙ্কিত কাহিনীর সাক্ষ্যবস্তু হয়ে সদর হাসপাতালে ল্যাবরেটরীতে চলে গেছে। আজ শুধু পুলিসের হেপাজতে ওর দেহটা চলেছে সদরে।

জনতা সাধ মিটিয়ে দেখছিল—এই সেই মেয়েটা, জলাপুরের সেই অপঘটনার নায়িকা। মানুষেরই জৈবক্ষুধার সেই হিংস্র কাহিনী আজ তিনদিন ধরে শুনে শুনে চারদিকের দশটা গাঁয়ের শুদ্ধাত্মা শিউরে উঠেছে।

মেয়েটার নাম আগো। সাহাদের নতুনবাড়ির দীঘি কাটাতে যে একদল মেয়ে-পুরুষ মজুর এসেছে, আগো এসেছিল তাদেরই সঙ্গে আর কাজ করছিল ভালই। কিন্তু হঠাৎ দুদিন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই সেদিন নিজেই থানায় এসে রিপোর্ট দিয়ে গেছে। তিনটে পানওয়ালা গ্রেপ্তার হয়েছে—আগো তাদের ঠিক ঠিক সনাক্ত করেছে। সেই বিচিত্র বীভৎসতার নায়িকা আগো এইখানে সশরীরে উপস্থিত। মেয়েটাকে ভাল ক'রে দেখ্‌বার জন্যে ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুতি আর মাথা ঠোকাঠুকি আরম্ভ হলো।

শান্তভাবে বসেছিল আগো। সহজ ভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল জনতার কাণ্ডকারখানা। মাঝে মাঝে মুখ নামিয়ে বড় লাজুক হাসি হাসছিল মেয়েটা। দেখতে সবচেয়ে অদ্ভুত লাগছিল এই হাসি। জনতার দৃষ্টির শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আগো; তবুও ওর গায়ে যেন কিছুই বিঁধ্‌ছে না। অপরিচিত এক পৃথিবীর বাসর-ঘরে যেন সকলে মিলে জোর করে ওর ঘোমটা টেনে নামিয়ে দিয়েছে। তারই পুলকে বিব্রত হয়ে না হেসে থাকতে পারছিল না মেয়েটা। শুধু চোখের তারা দু'টো মাঝে মাঝে ঝিক্ ঝিক্ ক'রে জ্বলে উঠছিল।

সন্ধ্যে হবার একটু আগে থাকতেই ভিড় কমতে আরম্ভ করলো। শেষ রাত্রির ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একজন সেপাই হালুইকরের দোকান থেকে কিছু খাবার এনে রাখলো আগোর সামনে।

—খেয়ে নে; যদি পেট না ভরে তো বলিস্, আরো এনে দেব। আমাদের চাক্‌রিটি খাবার জন্যে আজকের দিনটার মত মরে টরে যাস্‌নি বাবা।

আগোর খাওয়া শেষ হলো। ভিড় তখন আর নেই। সেপাই তিনজন কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়লো।

আগো একটা অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করছিল এবং একটা লজ্জাকাতর বেদনার দৃষ্টি দিয়ে সেপাইদের দিকে তাকাচ্ছিল বার বার। সেপাইরা ব্যাপারটা বুঝলো। কিন্তু ততটা প্রশ্রয় দেবার মত উদারতা দেখাতে সেপাইদের কেউ রাজী ছিল না।

বুড়ো গোছের সেপাইটা বলে—তোমাকে বাইরে যেতে হলে ঐখানে আমাদের সামনেই যাও। দূরে যেতে পারবে না।

রুষ্ট সাপের মত আগোর চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। চেঁচিয়ে বলে —আমাকে গরু পেয়েছ নাকি?

সেপাই তিনজন একসঙ্গে পাল্টা গর্জন ক'রে ধমক দেয়। —ওরে আমার পর্দানসীন রে! লজ্জার চোট দেখ একবার! যা হুকুম করছি চুপচাপ কর্, নয় তো এইখানে বসে থাক্, উঠতে পারবি না।

আগো চুপ করেই বসে রইলো।

কম্বলশয়ান সেপাইরা আগোকে প্রশ্ন করে—সত্যি বল্‌তো পানওয়ালারা তোকে টাকা দিয়েছিল, না এমনি…।

আগো মাথা নেড়ে জানালো—না টাকা দেয় নি।

—তুই চেয়েছিলি?

—হাঁ।

—থানাতে এই কথা বলেছিস?

—হাঁ।

তিন সেপাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। —তা হলে এই কেস আর টিকেছে। উল্টো তোরই কয়েদ না হয়ে যায়।

বুড়ো সেপাই আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে, তারপর আক্ষেপ করে—সত্যিই, এই জবরদস্তির মত পাপ আর কিছু হয় না। হাঁ, ফুস্‌লে ফাস্‌লে অনেক বদমাস অনেক কাণ্ড করে, কিন্তু তার একটা মানে হয়। কিন্তু এসব কোন্ জুলুম? গুণ্ডাদের বাড় বেড়েছে আজকাল, থানাও কিছু বলে না, নইলে……।

বুড়ো সেপাই কেন জানি রেগে উঠ্‌লো, আগোর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙ্‌চে বললো—তোমার অদৃষ্টে বারটা বেজে গেছে। এরি মধ্যে হয়েছে আর কি? আরও কত বেইজ্জতি আছে দেখবে। ডাক্তারি রে, সওয়াল রে, জেরা রে…। কেন এসেছিলি বাবা মজুর খাটতে এ বয়সে, এই বিদেশে?

কোন উত্তর দেয় না আগো। মুসাফিরখানার দেয়ালে টাঙানো কেরোসিনের ধোঁয়ায় ঘেরা আলোটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে, সাদা থান কাপড়ে জড়ানো শান্ত ও সুস্থির একটা দেহ।

রাত্রি দশটা। বরাচক স্টেশনের মুসাফিরখানায় তিনটি সতর্ক আইনের দূত তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন তখন আসানসোল পৌঁছে আবার হাঁসফাঁস করে অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছে কলকাতার দিকে। একটা থার্ড ক্লাস কামরায় বেঞ্চের নীচে ভীরু মুরগীর মত কুঁক্‌ড়ে শুয়েছিল আগো। চলন্ত ট্রেনের শব্দের আভরণ বাজছে স্বচ্ছন্দে—তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগোর হৃৎপিণ্ডটা যেন আসন্ন মুক্তির আশায় নেচে নেচে চলেছে।

এক ভদ্রলোক দশ বারটা কমলা লেবুর ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে কামরাতে ঢুকলেন। বেঞ্চের তলায় ঝুড়িগুলি সাজিয়ে রাখতে গিয়েই বাধা পেলেন। তারপর নীচু হয়ে বেঞ্চের তলায় উঁকি দিয়ে সরোষে একটা ধমক দিলেন।—এই চোট্টা, নিকাল্ শীগ্‌গির, নইলে চেকার ডেকে এক্ষুনি ধরিয়ে দেব।

ভদ্রলোক বেঞ্চের ভেতর হাত ঢোকালেন মানুষটাকে টেনে বার

করার জন্য। ট্রেনের অন্য আরোহীরা হাসির সোর তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—হাঁ হাঁ হাঁ, করেন কি ?

ভদ্রলোক।—কি ব্যাপার ?

আরোহীরা।—মেয়ে মানুষ শুয়ে আছে। ওর টিকিট নেই।

ভদ্রলোক—হা পরমেশ্বর! এ'কে কি মেয়েমানুষ বলে! এমনি করেই লাজ লেহাজ বিসর্জন দিতে হয়!

ভদ্রলোক একটা ধিক্কার দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সারারাত ট্রেন চললো, আসানসোল থেকে কলকাতা। বেঞ্চের ওপর থেকে নানা জাতের যাত্রীর দশজোড়া পা সাপের মত ঝুলে রইল। যতদূর সম্ভব আগো তার শরীরটাকে এই সর্পিল সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু বৃথা। পামশু-পরা, খড়ম-পরা ও নাগরা-পরা পা'গুলি সারা রাত ধরে এবং নানা কৌশলে ক্ষুধার্ত নখরের মত বেঞ্চের নীচে যেন অন্ধকারের মাংস খুঁজে বেড়ায়। কখনও বা বেপরোয়া আঁকড়ে ধরে—পিষে দেয়। সত্যি করে শ্মশানের শব তো নয়, একটা চোর মেয়েমানুষের জ্যান্ত দেহ, সে দেহের অদ্ভুত একটা আস্বাদ আছে ; একটু আঘাত এবং বেশ একটু যন্ত্রণা না দিলে সে আস্বাদের সুখ পূর্ণ হয় না।

একজন রেল মিস্তিরি পাশের বেঞ্চে বসেছিল। হঠাৎ যেন একটা রসিকতার দমকা লেগে লাফিয়ে উঠলো, বেঞ্চের তলার দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে চেঁচাতে লাগল।—বিচ্ছু! বিচ্ছু! ইয়া বড় বিচ্ছু! শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়।

কামরার আরোহীর দল হো হো করে হাস্‌তে থাকে।

ভোর বেলা। হাওড়া স্টেশনের সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফটক দিয়ে যাত্রীরা বোঁচ্‌কা-বুঁচকি নিয়ে টিকিট দেখিয়ে পার হচ্ছে। সেই স্বচ্ছন্দ জনপ্রবাহের সঙ্গে আগোও এগিয়ে চলেছিল। বাধা পড়লো ফটকে। চেকার টিকিটের দাবী জানিয়ে আগোর মুখের দিকে উৎসুকভাবে

তাকিয়ে রইলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে আগো যা বল্‌লো তাতে কোন অর্থ স্পষ্ট বোধগম্য হলো না।

—খাড়া রহো! টিকিট চেকারের হুকুমে আগো একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রইলো। চেকার মশায় আগোর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাকী যাত্রীদের টিকিট চেক ক'রে গেটের কাছে জনারণ্যের ঝড় সামলাতে লাগলেন। ভিড় ফাঁকা হয়ে গেলে আবার এদিকে মনো-যোগ দিলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণে গোঁফের ডগা চিবিয়ে দুবার হাসলেন। ইতিউতি দুবার তাকালেন। তারপর টিকিট ফুটো করার যন্ত্রটা দিয়ে আগোর পিঠে আস্তে একটা চাপ দিয়ে, ব্যস্তভাবে বললেন—জলদি ভাগ্‌ এখান থেকে। আর কেউ ধরে ফেললে আরও অনেক কিছু আদায় ক'রে ছাড়বে।

আগো একটু তাড়াতাড়ি হেঁটেই চলে গেল। শুধু পানওয়ালারাই নয়, দুনিয়ার জীবাত্মা যেন একটা জুলুমের আনন্দে মতিচ্ছন্ন হয়ে আছে। শুধু জোর আর জোর। এ ছাড়া কি অন্য ব্যবহার ভুলে গেছে সবাই? কিন্তু চাইলেই তো অনেক কিছু দেওয়া যায়, বললে অনেক কিছু শোনা যায়, অনুরোধে অনেক কিছু বিনিময় করা যায়। কিন্তু শুধু জোর আর জবরদস্তি। এ কোন্‌ রীতি?

শহর কলকাতা—বিস্ময়ে প্লাবিত দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে আগো। পথের পর পথ, শুধু চলার জন্যই, কোন গন্তব্য বোধ হয় নেই। তবু অতি বিচিত্র এই জনপদের রূপ। এই বর্ণ শব্দ গতির রূপ আগোর দেহমন এক নতুন পরিচয়সুখের আবেশে অভিভূত করে। বরাচক স্টেশনের ক্ষুদ্র জনতার মত এই শহর শুধু আগোর দিকে লোলুপ চক্ষে তাকিয়ে নেই। বিরাট এক ঐশ্বর্যের মেলায় সবাই যেন ঠাঁই পেয়েছে। সবাই পাশে পাশে চলে, কিন্তু কেউ কারও নয়। সাহাবাবুদের দীঘি, বরাচক স্টেশন, রাত্রির ট্রেন, হাওড়ার সাত নম্বর ফটক—একে একে সব ঘটনাই মনে পড়ে। সেখানে যেন পানওয়ালা—

দের মত গামছা দিয়ে একটা নারীদেহের মুখ-হাত-পা বাঁধবার জন্য একটা আয়োজন সর্বদা ওত পেতে বসে আছে। কিন্তু মনে হয় শহর কলকাতা সেরকম নয়। আগো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বলাৎকৃতা নারীর অভিমানের জ্বালা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল আগো।

হেঁটে চললো আগো—সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল। রাস্তার ধারে একটা কল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তার তলায় একটা মোষ আরামশয়ানে শুয়ে গায়ে জল নিচ্ছে। খুব তেষ্টা পেয়েছিল আগোর। জল খাবার জন্যে এগিয়ে যেতেই মোষটা শিং নাড়লো। কিন্তু মোষের এই শিং-নাড়া হুম্‌কি গ্রাহ্যই করলো না আগো, মোষের পাশে উবু হয়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে আঁজলা ভরে জল খেতে থাকে।

নির্বোধ দৃষ্টি তুলে মোষটা আগোর জল খাওয়ার দৃশ্য দেখতে থাকে শিং নাড়া থামিয়ে।

জল খাওয়া হয়ে যায় আগোর, তবুও জায়গাটা ছেড়ে যেতে যেন মন চায় না। দুই হাঁটুর ওপর চিবুক পেতে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে আগো। মোষটা এরই মধ্যে তার কাদাজলে মাখা গলাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আগোর পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছে। আগো যেন আরও নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সুখস্পর্শের নীড়ে সব ভাবনা ভুলে বসে থাকে। উঠে যেতে ইচ্ছে করে না।

গামছা-পরা একটা লোক হঠাৎ এসে কাছে দাঁড়ালো, বোধ হয় মোষের প্রভু; আগোর মুখের দিকে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটা, তারপরেই আগোর পাশে বসে মোষের গলার কাদা ধুয়ে দেবার জন্য জল ছিটাতে শুরু করলো।

লোকটাকে দেখতে পেয়েও অন্যমনস্ক হয়েই বসে ছিল আগো। কিন্তু এই অন্যমনস্কতার আনন্দটুকুও আর বেশীক্ষণ কপালে সইল না। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে এবং আশ্চর্য হয় আগো, গাম্‌ছা-পরা লোকটা একটা

হাত দিয়ে চিতে বাঘের থাবার মত আগোর হাঁটুটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

গামছা-পরা চিতে বাঘের হাতটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় আগো। চলে যায়, পেছন দিকে আর তাকায় না।

অনেক ক্ষণ ধরে নানা পথে ও নানা দিকে শুধু চলতেই থাকে আগো। এতক্ষণে মনে হয়, যাদুকরের তৈরী এই শহরে পথ আছে অনেক, কিন্তু পথের শেষ নেই। শুধু হাঁটা যায়, কিন্তু দাঁড়ানো যায় না। শুধু ক্লান্ত হওয়া যায়, কিন্তু ক্লান্তি রাখবার মত কোন শাল-মহুয়ার ছায়া নেই এখানে।

রোদে পথ চল্‌তে চল্‌তে অনেকক্ষণ পরে দাঁড়াবার মত একটা জায়গা চোখে পড়ে আগোর। জায়গাটাতে ছায়া আছে। এগিয়ে যায় আগো।

হঠাৎ চোখে পড়ে—একটু দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে তাকিয়ে। রুগ্ন বকের মত শীর্ণ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, হাতে একটা ছড়ি। আগোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লোকটা হাসলো। কালো-কালো দাঁতের হাসি, পান-খেকো লাল জিভটাও দেখা যায়—কেমন ঘেয়ো ঘেয়ো।

এমন সুন্দর শহরে এই নেকড়েটা এলো কোথা থেকে? গত তিনটি কালরাত্রির আতঙ্ক আবার আগোকে ভাবিয়ে তুললো। আবার অন্য পথে ঘুরে যেতে হল আগোকে।

পথে যেতে যেতে বার বার পেছনে তাকায় আগো এবং দেখতে পায়, লোকটা প্রেত-ছায়ার মত ঠিক ধাওয়া করে আসছে। চোখাচোখি হলেই সেই কালো দাঁতে অদ্ভুত হাসি চম্‌কে ওঠে। একএক সময়ে আবার কোথায় যেন লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। আগোর মন থেকে আশঙ্কার ভার নেমে যায়।

কারখানাগোছের একটা বাড়ির ফটকের সামনে এসে, দাঁড়ায় আগো, দেখতে দেখতে তার চারদিকে একটা ভিড় জমে ওঠে।

ভিড়ের ভেতর থেকে নানা জনে নানা প্রশ্ন করে। বাড়ি কোথায়? যাচ্ছ কোথায়? কি কাজ কর? কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না আগো। ভিড়টা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আগোকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে।

উত্তর দিতে চেষ্টা করে আগো, কিন্তু কি বল্‌বে ভেবে পায় না। কারণ, সে নিজেই জানে না, কোথায় চলেছে সে। শুধু এইটুকু স্মরণ করতে পারে, সে পালিয়ে এসেছে আদালত আর ডাক্তারীর ভয়ে, এবং এখনো পালিয়ে চলেছে। পেছন থেকে একটা ব্যাধের দল যেন এখনো তাড়া করে আস্‌ছে তার জ্যান্ত দেহটাকে ধরবার জন্য। জবরদস্তি করো না, দুটো কথা জিজ্ঞেস ক'রে নাও, একটু ভাব্‌তে দাও, রাজী হই কিনা একটু অপেক্ষা করে দেখ—হাত জোড় ক'রে, মাটিতে মাথা ঠুকে, দু'চোখ জলে ভাসিয়ে, আর অভিশাপের ভয় দেখিয়ে বারবার অনুরোধ করলেও কোন ফল হয় না যে পৃথিবীতে, সেই পৃথিবী থেকে কোন মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে আগো।

ভিড়ের ভেতর থেকেই আগোর পেছনে দাঁড়িয়ে কে যেন আচম্‌কা তার আঁচলটা টেনে দিয়ে সরে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না আগো, শুধু দু'হাতে স্খলিতপ্রায় কাপড়টাকে শক্ত করে চেপে ধরে এবং সতর্ক হয়। বুঝতে পারে, ভিড়টা যেন তার শ্লথবসন ও বিব্রত শরীরটার সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠ হবার জন্য আরও কাছে এগিয়ে আস্‌ছে।

সামনের দিক থেকে ভিড়ের দু'টো লোক এগিয়ে এসে আগোর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্‌তেই পাশ কাটিয়ে সরে যায় আগো। সবেগে জনতার বেড়া ভেদ করে বাইরে এসে পড়ে। এরই মধ্যে অনুভব করে আগো, ভেতর থেকে একটা লম্বা হাত মুহূর্তের মধ্যে তার কোমরের ওপর জোরে একটা চিমটি কেটে আবার লুকিয়ে পড়ল।

দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যায় আগো। শুনতে পায়, পেছনের ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বল্‌ছে—পাগল, আস্ত পাগল! আর একজন বলে—বদ্‌মাস। এর পর আর একজন কি বল্‌লো শুন্‌তে পেল না আগো, ততক্ষণে ভিড়ের কাছ থেকে অনেকটা দূরেই সে চলে গিয়েছে।

আগো বিশ্বাস করে, সে পাগল নয়, সে বদ্‌মাস। সে নিজে একথা জানে, এবং তারাও সবাই জানে যারা আগোকে জানে। আগোর গাঁয়ের লোক, পাশের গাঁয়ের লোক এবং কুটুমের দল, সবাই জানে--আগোর চরিত্র নেই। মাদি জন্তুরও যেটুকু সতর্কতা থাকে নিজের সম্বন্ধে, মানুষের মেয়ে হয়েও আগোর সেটুকুও নেই। যতবার গাঁয়ের বাইরে কয়লাখনিতে কামিন খাটতে গেছে আগো, ততবার একটা না একটা ঘটনায় সে ধরা পড়ে গেছে। সর্দার বিরক্ত হয়ে আগোকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন দলে ভর্তি হয়েছে আগো। কিন্তু আবার। আবার একদিন মাঝরাতে রাস্তার ওপর একটা রহস্যময় মোটরগাড়ির হর্ন শুনে ধাওড়া ছেড়ে বের হয়ে গেছে আগো। ফিরেছে যখন, তখন ভোর হয়ে গেছে, এবং আগোর দু'কানে তখন দু'টি মেকি সোনার দুল, খোঁপায় চামেলী তেলের গন্ধ এবং আঁচলে বাঁধা দু'টো টাকা।

অনেক পথ চলা হয়েছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যেই একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে দাঁড়ায় আগো। পথ ছাপিয়ে মানুষের দল স্রোতের মত চলেছে, দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে আগোর। এত মানুষও আছে পৃথিবীতে এবং এত মানুষের থাকবার জায়গাও আছে!

আন্‌মনা হয় আগো। মনটা হঠাৎ উধাও হয়ে যেন ভেলুডিহির কাছে সেই পাথরবিছানো নতুন সড়কের ধারে খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী একটা কুলিশিবিরের ভেতর ফিরে গিয়ে ঠাঁই খুঁজছে। অনেক দিন মনে পড়েছে, বার বার মনে পড়েছে, এবং আজ কেন জানি আরও

বেশি ক'রে মনে পড়্ছে ভেলুডিহির কথা। এক মাটি-কাটা দলের সঙ্গে গত বছর শীতের শেষে কামিন খাট্‌তে গিয়েছিল আগো ভেলুডিহির নতুন সড়কে। মাত্র সাতটা দিন পরেই দেখা হয়েছিল তরে সঙ্গে, ঝাঁকড়া চুলে চিরুনি গোঁজা সেই রাখালটার সঙ্গে, একটা পাহাড়ী স্রোতের কাছে, সেই সকালে জল আন্‌তে গিয়ে। শালপাতার ঠোঙায় করে কতগুলি পাকা ডুমুর এনে দিল রাখালটা, তারপর আগোর হাত থেকে কলসীটা নিয়ে স্রোতের মাঝখান থেকে জল ভরে আন্‌লো। নিজেই কাঁধে ক'রে জলভরা কলসীকে আগোর খেজুর পাতার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর, সেই সন্ধ্যাতেই খেজুরপাতার কুলিশিবিরের ওপর যখন চাঁদের আলো পড়েছে, তখন বাঁশি বাজ্‌লো নিকটেরই একটা শালগাছের ছায়ার অন্ধকারে। ঘরে থাকতে পারেনি আগো। সেই বাঁশির আহ্বান ব্যর্থ হতে দেয়নি।

বাঁশির সুরে ডাক্‌লেই তো হয়, একটু হাসিমুখে অনুরোধ করলেই তো হয়! এক ঠোঙা ডুমুর হোক্, একটু চামেলী তেলের গন্ধ হোক্, দুটো টাকা হোক বা এক জোড়া মেকি সোনার দুল হোক্—যা হোক্ কিছু উপহার আর মূল্য দিলেই তো হয়। কিন্তু চিতে বাঘের মত থাবা দিয়ে ধরা আর গাম্‌ছা দিয়ে মুখ বেঁধে সব ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে চুপ করিয়ে দেওয়া, এ কোন্ রীতি? এমন রীতি যে কোন জানোয়ারেও সইবে না! কিন্তু এই সামান্য কথাটা অনেকে বোঝে না, আশ্চর্য! বিমর্ষভাবে পথের চলন্ত জনতার দিকে তাকিয়ে আগোর মনে হয়, এমন অবুঝের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী।

এগিয়ে যায় আগো। কোথায় যাচ্ছে, যদিও সে তা জানে না, তবু এতক্ষণে বুঝতে পারে মন তার কি খুঁজছে। কিন্তু এ শহরে তো শালবন নেই। এখানে সন্ধ্যে হলে গাছের নীচে কোন বাঁশি যে বাজতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে না আগো। এখানে সন্ধ্যের পর আকাশে চাঁদ ওঠে কি না, কে জানে! ভুল হয়েছে, পালাতে গিয়ে

ভুলপথে একেবারে নতুন ও অদ্ভুত একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছে আগো। কিন্তু একটা আশ্রয় যে চাই!

চোখে পড়ে, একটু দূরে ঘাসে ঢাকা ছোট এক টুক্‌রো মাঠ, তার ওপর এখানে-ওখানে এক একটা গাছ। একটা গাছের ছায়ায় বসে একটা বুড়ী উনান জ্বেলে টিনের গাম্‌লায় ভাত রান্না করছে। আগো এগিয়ে যেয়ে বুড়ীর কাছে বস্‌লো ফুটন্ত ভাতের বাষ্পের দিকে তাকিয়ে।

বুড়ী বলে—তুমি এখানে কেন গো? তোমার ভাবনা কিসের, অমন গতর থাক্‌তে?

বুড়ীর ভাষা না বুঝলেও আগো এইটুকু বুঝতে পারে, বুড়ী তাকে ভাত খেতে অনুরোধ করছে না।

উঠ্‌তে হবে, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না। যেতে হবে, কিন্তু কোন্ পথে যাবে এবং গেলেই বা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, কিছুই বুঝতে পারে না আগো।

চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে আগো, এবং দেখ্‌তে গিয়ে চম্‌কে ওঠে। ছোট মাঠের আর একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই কালোদাঁত ও লালজিভ লোকটা, আগোর দিকেই হাসিমুখে তাকিয়ে হাতের ছড়ি দোলাচ্ছে।

উঠে পড়ে আগো এবং চোখের সাম্‌নে যে গলিটা দেখতে পায় তারই ভেতর ঢুকে হন্‌হন্ করে হাঁটতে থাকে। অনেক দূর চলে আসবার পর পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখে নিশ্চিন্ত হয়, কালোদাঁত আর লালজিভ নিয়ে কোন হাসি-হাসি মুখ নেক্‌ড়ে আর পিছু ধাওয়া করে আস্‌ছে না।

একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় আগো। বুঝতে পারে, এটা একটা দেবতাবাড়ি, একটা মন্দির। আগোর গাঁ থেকে ধানবাদ যাবার পথে ঝিলের ধারে ঠিক এই রকম একটা দেবতাবাড়ি

আছে, যেখানে সন্ধ্যাবেলা ঘন্টা বাজে এবং সাধুবাবারা শুয়ে থাকেন দাওয়ার ওপর।

মন্দিরটার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল আগো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরের ভেতর থেকে মোটা মোটা চেহারার জনতিনেক লোক বের হয়ে এল। তাদের মাথায় বড় বড় টিকি আর কপালে তিলক। এরকম মানুষ এর আগেও দেখেছে আগো।

আগোর মুখের দিকে তাকিয়ে একজন জোরে নিঃশ্বাস ফেলে, একজন হাই তোলে এবং একজন আঙ্গুল মট্‌কাতে থাকে। আগো জিজ্ঞাসা করে—গির্জা যাব কোন্ পথে?

—গির্জা? কেন? তুই কোন্ জাত?

—খিরিস্তান হব।

তিনজনেই একসঙ্গে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমক দেয়, বিদ্রূপও করে —তার চেয়ে ভাল বিলেত চলে যা, যেখানে তোর শ্বশুরের ছেলে বসে আছে।

হুম্‌কি দেখে আগো আবার পিছিয়ে এল। সুমুখে তাকাতেই চোখে পড়লো, কালোদাঁত লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে প্রায় ছুটে চলে যায় আগো। আর কোথাও থামে না, ফিরে তাকায় না, যেন মরুভূমিতে ক্লান্ত ঘোড়ার মত মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে আগো, মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আর থাম্‌বে না।

সন্ধ্যা হয়েছে। ময়দানের ধারে একটা গাছতলায় বসেছিল আগো। কাল রাত থেকে খাওয়া নেই। অবসাদে শরীরটা পাথরের মত অনড় হয়ে এসেছে। তেষ্টায় গলার নালিটা শুকিয়ে আর ঝিঁ-ঝিঁ ধরে কাঁপছে।

অনেক ঘুরেছে। একটা গির্জেও খুঁজে বের করেছিল আগো, কিন্তু গির্জের ফটকটা কি প্রকাণ্ড। সমস্তক্ষণ বন্ধ থাকে। সেখানে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে এসেছে আগো। ভেতরে ঢোকবার সাহস হয়নি।

বৈশাখের সূর্য পশ্চিমে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। গির্জের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে বেজে থেমে গেছে। চৌরঙ্গীর দালানগুলির মাথায় যেন অতিদূরের একটা দগ্ধ জ্যোতিষ্কের রক্তাভ জ্বালা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আগোর জীবনে এই সন্ধ্যা সম্পূর্ণ অভিনব। গরু চরিয়ে শালের ডাঙ্গায় হাটুরে পথ ধরে ঘরে ফেরার ক্লান্ত-সন্ধ্যা নয়। শব্দের হর্ষে এই শহরের প্রাণ যেন দিনের শেষে নতুন করে ঝুমুর গেয়ে উঠেছে।

তেলেভাজার ঝুড়ি নিয়ে, কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে একটা লোক নিকটেই দোকান সাজিয়ে বসলো। আগো তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর কখন্ ঘুমে চোখ বুঁজে এসেছে তা সে নিজেই জানে না।

ভুল ভেঙ্গে গেছে আগোর। এত রোশনাই, এত সুশব্দ, এত হাসি-খুশী—প্রকাণ্ড একটা কল চলছে শুধু। এও আর একরকমের একটা উল্টো পুরী—শুধু পথ আছে, আশ্রয় নেই। কেউ এখানে মন দিয়ে মন খোঁজে না, বাঁশির সুরে কাছে ডাকে না, মূল্য দিয়ে আদায় করতে চায় না। শুধু পথ আটক করতে চায় গায়ের জোরে।

প্রয়োজনহীন মাটির ঢেলার মত পড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে কালই সকালে, যদি আজকের রাতটার মত প্রাণটা বাঁচে।

একবার আচমকা চোখ মেললো আগো। তেলেভাজার পশারীটা তখনও কুপি জ্বালিয়ে বসে আছে। তার সামনে বসে আছে একটা লোক—ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে খাবার খাচ্ছে। নজর পড়তেই চমকে

ওঠে আগো, বুকটা ধড়ফড় ক'রে ওঠে। ঐতো দেখা যায়, লোকটার কালো দাঁত উদার আনন্দে হাস্ছে আর লালজিভ কাঁপছে।

ইচ্ছে করে আগোর, মাঠের এই কিনারা থেকে, এই মিট্‌মিটে কেরোসিনের আলোর ষড়যন্ত্র থেকে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে মাঠের ভেতরে সত্যিকারের অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে। সারা রাত দু'হাত দিয়ে প্রাণপণ জোরে মাটি আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে থাক্‌তে, যেন পৃথিবীর কোন মাংসলোপুপ পৌরুষের জানোয়ার শত নির্মম চেষ্টা করেও তাকে আর টেনে তুলতে আর এই মেয়েলী শরীরটায় সব গর্ব রূঢ় অপমানের আঘাতে চূর্ণ করতে না পারে।

চারদিকে আলো নিববে কখন, আর শেয়াল ডাকবে কতক্ষণ পরে? মাঠের ভেতরে ঘনতর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে আগো, আজ রাতের মত ঐখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারা যাবে বোধ হয়। ঐ অন্ধ মাঠের ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে তার নিঃশ্বাসের সব শব্দ লুকিয়ে ফেল্‌তে পারবে। লালজিভ আর কালো-দাঁত এই লোকটার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে দৌড়ে সরে পড়্‌তে হবে মাঠের ভেতরে ঐ অন্ধকারের মধ্যে, যেন পিছু ধাওয়া কর্‌বার আর কোন পথ না খুঁজে পায় লোকটা।

লোকটা কি এখনো তাকিয়ে আছে? মুখ ফিরিয়ে আড় চোখে তাকাতে গিয়েই চমকে ওঠে আগো। সর্বনাশটা যে একেবারে কাছে এসে পড়েছে, এবং আগোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার পায়ে যেন মানুষখেকো বাঘের পায়ের মত নরম থাবা আছে, হাঁটলে শব্দ হয় না। এত নিঃশব্দে কেমন করে কখন কাছে চলে এসেছে, কিছুই বুঝতে পারেনি আগো।

ভয় পায়, বুক ধড়ফড় করে আগোর। মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে বুকের ভেতরে আতঙ্কিত নিঃশ্বাসগুলিকে সামলাতে গিয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, আগোর মনের সব ভীরুতা হঠাৎ মথিত

ক'রে একটা হিংস্র আক্রোশ মরিয়া হয়ে জেগে ওঠে, আরণ্য শ্বাপদিকার চোখের মতই। গায়ে হাত দেবার আগেই লোকটার টুঁটি কামড় দিয়ে ধরবার জন্য এবং লালজিভটাকে খিমচে ধরে উপড়ে ফেলার জন্য গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আগো।

কিন্তু একটু অপ্রস্তুত হয়ে এবং একটু বিস্মিত হয়েই লোকটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে আগো। একটা ঠোঙায় ক'রে তেলে-ভাজা খাবার নিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। আগোর হাতের কাছে ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলে—উঠ্‌লে কেন? বসো, খাবার খেয়ে নাও, তারপর রাস্তার ধারে ঐ কল থেকে জল খেয়ে এস।

কোন কথা বলে না আগো। হাত তুলে খাবারের ঠোঙাটা নিতে পারে না। শুধু লোকটার মুখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে।

খাবারের ঠোঙা মাটিতে নামিয়ে রেখে লোকটা বলে—লজ্জা করো না, ভয় করবারও কিছু নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল, আমি দেখেছি, আজ সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি।

অপ্রস্তুত হয়েছিল আগো, এইবার বিচলিত হয়। সত্যই তো লোকটা নেকড়ে নয়, জলাপুরের পানওয়ালা নয়। কাছে এসেও লোকটা শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাত তোলা দূরে থাকুক্‌, এখন পর্যন্ত একটা লোভের কথাও বলেনি লোকটা। মাঠের কিনারায় এই এক কোণে নিরালা আবছায়ায় মধ্যে জোর করার সুযোগ পেয়েও লোকটা এক ঠোঙা উপহার তার পায়ের কাছে রেখে দাঁড়িয়ে আছে, দেবতাবাড়ির ভক্তের মত।

ভুল হয়েছে আগোর। ভুল বুঝতে পারে, এবং মনে মনে একটু অনুতপ্তও হয়। আজ সকাল থেকে এই পরিচয়হীন শহরে যে সমাদরের আহ্বান তার পিছু পিছু ঘুরেছে, তাকেই মনের ভুলে কি ভয়ানক সন্দেহ করেছে আগো!

লোকটার মুখের ওপর অদূরের কেরোসিন কুপির কম্পিত শিখা থেকে মলিন একটুখানি আলোর কাঁপুনি এসে লাগছে। তাইতেই দেখা যায়, লোকটা শান্তভাবে হাসছে। চোখ ফিরিয়ে নেয় না আগো বরং সাগ্রহে দেখতে থাকে লোকটার মুখটা ধীরে ধীরে কেমন সুন্দর হয়ে উঠছে।

কি একটা কথা আগো বলতে চেষ্টা করতেই লোকটা বাধা দিয়ে বলে—তুমি আগে খেয়ে নাও, তার পর কথা হবে।

আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করে না আগো। ঘাসের ওপর বসে পড়ে এবং তেলেভাজার ঠোঙা হাতে তুলে নেয়। নিঃসঙ্কোচে এবং লজ্জাহীন উৎসাহে খাবার খেতে থাকে।

খেতে খেতে হাসি ফুটে ওঠে আগোর মুখে। এতক্ষণে যেন ধন্য হয়েছে আগোর আত্মা। সারাদিনের ভিড় থেকে এতক্ষণে একটা মানুষ বের হয়ে এসেছে আগোকে মূল্য দেবার জন্যে, উপহার দিয়ে আপন করার জন্যে, মান দিয়ে মন পাওয়ার জন্যে।

ভয় করা দূরে থাক, একটু ব্যস্তভাবেই খাবার খেতে থাকে আগো, কারণ লোকটার হাতে হাত রাখবার জন্য মনটাও যেন এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আগোর খাওয়া শেষ হয়। লোকটা বলে—তুমি এখানেই থাক, আমি জল নিয়ে আসছি।

চলে যায় লোকটা। তেলেভাজার দোকান থেকে দুটো মাটির খুরি নিয়ে রাস্তার কিনারায় কলের দিকে জল আনতে চলে যায়। বসে বসে শুধু দেখ্‌তে থাকে আগো। জানা নেই, চেনা নেই, একটা লোক তার তৃষ্ণার জল আন্‌বার জন্য ছুটোছুটি করছে, দৃশ্যটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন আগোর তৃষ্ণা মিটে যাচ্ছে। এমন মানুষের কাছে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে ছেড়ে দিতে কোন আপত্তি নেই আগোর।

জল নিয়ে ফিরে এল লোকটা। আগো তার ঠোঁট দুটো কুণ্ঠাহীন

ইচ্ছায় সুস্মিত ক'রে লোকটার মুখের দিকে তাকায়, হাত বাড়িয়ে জলের খুরি তুলে নেয়।

দুই চুমুকে জল খেয়ে নিয়ে মাটির খুরি দু'টোকে অন্ধকারের মধ্যে সবেগে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আগো, কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখটা জোরে ঘষা দিয়ে মুছে নেয়। ভুরু বাঁকা ক'রে তাকায়, মিটিমিটি হাসে, এবং গা-মোড়া দিয়ে ক্লান্ত দেহের অলস সংযম নিলর্জ্জের মত ভেঙ্গে দিয়ে বলে—এইবার বল, কি বলছিলে?

লোকটা হাসে—তুমি বল।

আগো—তুমি যা বলবে, তাই হবে।

লোকটা কৃতার্থভাবে বলে—আমার সঙ্গে চল।

এক সঙ্গেই দু'জনে উঠে দাঁড়ায় এবং মাঠের নিভৃত কিনারা ছেড়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়।

চলন্ত মোটরবাসগুলি একের পর এক এসে থামে আর চলে যায়। লোকটা কৌতূহলী হয়ে এক একটা মোটর বাসের মাথায় লেখা নম্বর পড়তে থাকে, তার পরেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পছন্দমত কোন মোটর বাস যেন খুঁজে পাচ্ছে না লোকটা।

একটা নীল রঙের বাস এসে দাঁড়ায়, অনেক দূরে যাবার বাস, কলকাতা শহরের সীমা ছাড়িয়ে একটা চটকলের এলাকায় গিয়ে এই বাস থামে। আগোকে নিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে যায় লোকটা, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে থম্‌কে দাঁড়ায়, সামান্য দূরে একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে সতর্ক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে।

নীল রঙের বাস চলে যায়। লোকটা ছটফট করতে থাকে। আগোর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আমার সঙ্গে তোমার আর যাওয়া হতে পারে না।

আগো বিরক্ত হয়, এবং একটু অপমানিত বোধ করে—কেন?

লোকটা বিব্রতভাবে বলে—পুলিস আমার পিছু নিয়েছে। তুমি থাকলে আমি পালাতে পার্‌বো না।

আগো চম্‌কে ওঠে, তার পরই মুখ ভার করে, এবং তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—পালাও, এখুনি পালিয়ে যাও।

লোকটা বিষণ্ণভাবে হাসে—তোমাকে কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না তো?

আগো তিক্তস্বরে বলে—না; কোন অসুবিধে হবে না।

কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে লোকটা। তার পরই জিজ্ঞাসা করে—তোমার যাবার জায়গা আছে তো?

আগো—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

লোকটা—চেনা লোক কেউ নেই?

আগো—জানি না।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ কি ভাবে। তার পরই ব্যস্তভাবে বলে—তাড়াতাড়ি বল।

আগো—কি বল্‌বো?

লোকটা—কি করতে হবে বল। তোমার একটা ব্যবস্থা না ক'রে আমি যে পালাতে পারছি না।

আগো—তুমি যাও।

লোকটা—তুমি কোথায় যাবে?

আগো—আমি এখানেই থাক্‌বো।

লোকটা—এই মাঠের মধ্যে?

আগো—হ্যাঁ।

লোকটা—তা'হলে তোমার কি আর কিছু থাক্‌বে?

আগো—তাতে তোমার কি?

আবার কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন ভাব্‌তে থাকে লোকটা। তারপরেই জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাড়ি কোথায়?

আগো—জামুডিহি।

লোকটা—কোন্ স্টেশন?

আগো—ধানবাদ।

এক সঙ্গে চারটে বাস এসে থেমেছে। যাত্রীদের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে হল্লা হচ্ছে খুব। আগোর হাত ধরে ব্যস্তভাবে টান দেয় লোকটা—চটপট চলে এস।

একটা বাসের ভেতর দু'জনে উঠে বসে।

হাওড়া স্টেশন। ধানবাদ যাবার থার্ড ক্লাসের একটা টিকেট কিনে নিয়ে লোকটা আগোকে বলে—একটু চট্পট্ পা চালিয়ে চল, আর সময় নেই।

বেশী সময় আর ছিল না, ধানবাদ যাবার ট্রেনের ইঞ্জিন তখন রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জোরে ধোঁয়া ছাড়ছিল। মেয়েদের থার্ড ক্লাসের একটা কামরায় আগোকে উঠিয়ে দিয়ে লোকটা বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রইল, কামরার জানালার কাছে। হাঁপ ছেড়ে এবং খুশী মনে লোকটা বলে—ব্যস, আর কোন ভাবনা নেই।

আগো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে অদ্ভুত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কিসের ভাবনা?

লোকটা—তোমার জন্যেই ভাবনা হচ্ছিল খুব। তুমি একটা আস্ত জংলী, তোমার একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। এই বয়সের মেয়েমানুষ রাতের বেলা মাঠের মধ্যে পড়ে থাক্‌লে তার গায়ের মাংস কি আর এক টুকরোও খুঁজে পাওয়া যেত? জান না তো বাছাধন, কলকাতা জঙ্গলের চেয়েও কত বেশী ভয়ানক।

হো হো ক'রে হেসে ওঠে লোকটা। সে হাসির শব্দে আগোর হৃদপিণ্ডটাই উল্টেপাল্টে কেমনতর হয়ে যেতে থাকে। একটা আক্রমণের নরক থেকে সরিয়ে নিয়ে আগোকে নির্ভয়ের জগতে পৌঁছে

দিতে এসেছে লোকটা, এবং মাত্র এইটুকু করতে পেয়েই কত খুশী হয়ে গেছে। এক রাতের মেয়েমানুষকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে ভাবনা করে, উপহার দিয়ে আর উপকার করেই সরে যায়, এমন পুরুষ জীবনে এই প্রথম দেখ্‌লো আগো।

ট্রেনটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে চল্‌তে শুরু করে। লোকটা কাম্‌রার জানালা এক হাতে ছুঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে বলে—আমি যাই।

আগো—কোথায় যাবে ?

লোকটা—পুলিস যেখানে নিয়ে যাবে।

চম্‌কে ওঠে আগো। মুখ বিবর্ণ হয়। গলাভাঙ্গা স্বরে প্রশ্ন করে—পুলিসে নিয়ে যাবে কেন ?

লোকটা হাসে—সময়মত পালাতে তো আর পারলাম না, অনেক দেরি হয়ে গেল।

জংলী চোখে বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে আগো জিজ্ঞাসা করে—পুলিস তোমার পেছু নিয়েছে কেন ? কি কসুর করেছ ?

—আমার যে বদ্‌নাম আছে।

—কিসের বদ্‌নাম ?

প্ল্যাটফর্মের চঞ্চল ভিড়ের দিকে বন্যপশুর মত তাকিয়ে লোকটা বলে—ওরা আমাকে গুণ্ডা বলে, কলকাতায় থাক্‌তে আমার মানা আছে।

ব্যথিত বিস্ময়ে আগো যেন আর্তনাদ করে ওঠে—তুমি গুণ্ডা ?

লোকটা হাসে—হ্যাঁ গো, তুমি কি আমাকে একটা সাধু মহাত্মা ভেবেছিলে ?

ট্রেনের গতি একটু দ্রুততর হয়। দু'হাত দিয়ে লোকটার উল্কি আঁকা একটা হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে আগো এবং তার ওপর মুখটা পেতে দেয়।

ট্রেনের গতি আরও দ্রুত হয়। প্ল্যাটফর্মের ভিড় জোরে হল্লা করে। পৃথিবীর সব হল্লার বুক মাড়িয়ে ট্রেন যেন ছুটতে আরম্ভ করেছে কোন পরোয়া না ক'রে এবং পিছনে কারও দিকে না তাকিয়ে।

আঁকড়ে-ধরা হাতটা কখন্ কাম্‌রার জানালা থেকে সরে গেছে বুঝতে পারেনি আগো। ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে। মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় আগো, দু'জন পুলিস লোকটার হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে। সত্যিই পালাতে পারেনি লোকটা।

অনেকক্ষণ পরে, আর একবার চম্‌কে উঠল আগো। তারই পাশে বসেছিল যে বিলাসপুরী কুলিবুড়ীটা, সে-ই আগোর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—কাঁদ্‌বেই যদি, তবে মরদকে ছেড়ে দূরে যাও কেন?

চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে, বুঝতে পারে আগো; আর বুঝতে পারে, জীবনে এই প্রথম একটা মরদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার এই বহু বদনামের দেহটা যেন কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। কপাল মন্দ, এমন মরদকে কাছে পেয়েও হারাতে হলো, তাকে সুখী করার কোন সুযোগই পাওয়া গেল না।

তার পরই, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেরই মনকে বোঝায় আগো—লোকটা বোধ হয় কোন সাধু মহাত্মাই হবে। ভালই হয়েছে, এমন মানুষের হাতে শুধু মাথা ছুঁইয়ে সরে আসতে সে পেরেছে। এ-ছাড়া আর কিছু হলে খুবই খারাপ হতো, খুব পাপ হতো।

কাঞ্চনসংসর্গাৎ

অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী লিখবে কান্তিকুমার!

রামগড়ের যাদের বয়স আজ ত্রিশ বছরের কম নয়, তারা প্রত্যেকেই অটলবাবুর সাবেকী চেহারাটা স্মরণ করতে পারে। বাঙালীর মতই ধুতি আর কোট পরতেন, কিন্তু মাথায় ছিল প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি আর বগলে একটা তালিমারা ছাতা। মাসের পঁচিশটা দিন কেটে যেত কোন জংলী পরগণার ডিহিতে, কোন মান্‌ঝি অথবা মাহাতোর বাড়িতে খড়ের মাচানের ওপরে শুয়ে, ছাতু খেয়ে। দু'পয়সা কমিশনের লোভে গিরিমিটিয়া কুলি রিক্রুট করে ফিরতেন অটলবাবু। শেষে বাড়ি আসাই প্রায় ছেড়ে দিলেন।

অটলবাবুর স্ত্রী মণিমালা বলেছিলেন।—ছেড়ে দাও এ কাজ। দিন একরকম চলেই যাচ্ছে। ঘরে থেকে যদি পার, কিছু রোজগার কর। না পার দুঃখ নেই, আমি একরকম করে চালিয়ে নেবই।

অটলবাবু বলতেন।—মানুষের পিঁজরাপোল নেই মণি। বুড়ো বয়সে যাতে উপোস করে না মরতে হয়, সেই ভাবনাই ভাবছি। কুকুর বেড়ালেরও একরকম চলেই যায়। চলে যাওয়াটা কোন কথা নয়, কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমাতেই হবে।

গোঁসাইপাড়ার শেষপ্রান্তে দুটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে চার টাকা ভাড়ার একটা মেটে বাড়িতে মণিমালা থাকতেন। মেয়ে স্কুলে হিন্দি-দিদিমণির কাজটা পেয়েছিলেন, তাই পনেরটা টাকা মাসে মাসে আসতো। নিজের হাতে মাটি কুপিয়ে উঠোনে লাউ কুমড়ো ফলাতেন মণিমালা। সব্জীওয়ালা ডেকে দরদস্তুর করে নিজেই বেচতেন। তাঁর হাতের কাঁটা কুরুশ কখনো থামতো না। রান্নাঘরেই হোক বা

বিছানায় বসেই হোক, মাঝরাত্রি পর্যন্ত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লেস বুনতেন। পুজোর সময় নতুন পোশাক তৈরীর মরসুম লাগত ঘরে ঘরে, মণিমালার এই পরিশ্রমের পণ্য বিকিয়ে যেত সবই।

এই ভাবেই বছরের পর বছর পার হলো। জনা ও প্রীতি—ছুটি মেয়েই বড় হলো। দুজনেরই বিয়ে দিলেন মণিমালা। গরীব গেরস্থ ঘরের ছুটি ভাল ছেলেকেই পাত্র পেয়েছিলেন। বিয়ের খরচ যোগাতে দেনা করতে হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, নিত্য অনটনের পূর্ণগ্রাস থেকে যেন একটু একটু করে চাঁদির কণিকা বাঁচিয়ে সেই দেনাও শোধ করে দিলেন। তিনি কারও ধার ধরেননি।

মেয়েদের বিয়ের সময় অটলবাবু তবু ছুটো দিন উঁকি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মণিমালার অসুখের খবর পেয়েও সহসা চলে আসতে পারলেন না। রোগটাও খারাপ ছিল। ডাক্তারেরা বললেন—হয় এনিমিয়া, নয় টি-বি, তা না হলে বোধ হয় হলদে জ্বর, ভারতবর্ষের এই ফার্স্ট কেস। কাজেই কিভাবে যে ট্রীটমেণ্ট হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মোট কথা রামগড়ের সকলেই বুঝতে পারলেন, বিশ বছরের কাজের খাঁচায় পোষা একটি বাঙালী নারীর ঠুনকো প্রাণ এইবার সরে পড়ছে।

অনেক খোঁজতল্লাস করে অটলনাথের হদিস পাওয়া গেল। অনেক অনুরোধ করে তাঁকে বাড়ি ফেরানো হলো। প্রতিবেশী শ্রীনিবাসবাবুকে এর জন্য অফিস কামাই করতে হলো চারটে দিন। তিনি এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে শিকারী কুকুরের মত ঘুরেছেন, শুধু অটলনাথকে পাকড়াও করতে।

গোঁসাইপাড়ার প্রতিবেশীরা একটু বেশি রাগ করেছিল, মণিমালার অন্তিম অভিমান হয়তো একটু বেশি করে মনে বেজেছিল—কিন্তু ভুল হচ্ছিল সবারই। জীবনে যে মানুষ অন্তত হাজার গেরস্থকে

গিরিমিটিয়া করে ছেড়েছে, সে-মানুষের মনে ঘরের ধর্ম যে কবেই মিথ্যে হয়ে গেছে, তা সে নিজেই জানে না, পরের ধারণাতেও আসে না। কত ঘরের পুরুষকে ঘরছাড়া করেছে দালাল অটলনাথ—হাড়মাস তাদের সিঙ্গাপুরের রবার গাছের গোড়ায় পচে সার হয়ে গেছে। কত ঘরের শুধু ভিটে পড়ে আছে, কত ঘরের মেয়ে জাতের বার হয়েছে। কত শিশু ভিখিরি হয়েছে। আর দালালির কমিশনে থলি ভরে উঠেছে অটলনাথের। মণিমালা মরবেন, অটলনাথের ঘরের প্রদীপটি নিবে যাবে, এর মধ্যেও আজ বিচলিত হবার মত কোন আঘাত পায় না অটলনাথ।

প্রতিবেশীরা একের পর এক এসে অটলনাথকে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন—খুব দেখালেন মশাই! এবার যদি ভাল চান তো ওঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

জনা আর প্রীতি, মেয়ে দুটো ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অটলনাথের উদ্বেগ বাড়িয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে মরণপথযাত্রিণী মায়ের কাছে এসে জুটলো। মেয়ে দুটোর কান্নাকাটি, ডাক্তার ডাকাডাকি, লম্বাচওড়া ওষুধের প্রেসক্রিপসন, ফুড আর ফলের ফর্দ—চারিদিক থেকে একটা দাবীর ঝড় যেন ষড়যন্ত্র করে অটলনাথের টাকার থলিটাকে ধ্বংস করার জন্য দাপাদাপি শুরু করল।

এই সঙ্কটে অটলনাথকে বাঁচিয়ে দিল কান্তিকুমার।

টাকার থলিটা কান্তিকুমারের কাছে সঁপে দিয়ে অটলনাথ প্রায় কেঁদে ফেললেন—কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। এ'শহরে তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার গায়ের রক্ত-জল করা এই সামান্য পুঁজি, তোমার কাছেই থাকুক। তোমার মণিমাসী তো ফাঁকি দিয়ে আমার আগেই চললেন। শুধু কুটোর মত আমি একাই সংসারে ভেসে রইলাম। নেহাৎ প্রাণের দায়ে না পড়লে এই জঞ্জাল আর তোমার কাছে ফিরে চাইতে আসবো

না। ওসব তোমারই হবে। তুমি এটা রেখে দাও তোমার কাছে। আর, কেউ যেন টের না পায় যে এটা তোমার কাছে আছে।

মণিমালা বেশী দেরি করেননি। সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন। অটলনাথের থলিভরা ভবিষ্যৎ অটুট হয়ে কান্তিকুমারের কাছেই রইল। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে এক পয়সাও খরচ করতে না পেরে অসহায় অটলনাথ কাঁদলেন অনেক, প্রতিবেশীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিল অনেক। এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

রামগড়ের বাতাসে একটা গোপন খবর ফিসফিস করে—কান্তিকুমার আর জয়া, জয়া আর কান্তিকুমার।

প্রতাপবাবুর মত একটি পিতৃদেব ছাড়া আপন বলতে জয়ার আর কেউ নেই। আজ ওর বয়স সাতাশ বছর। আপন করে নেবার মত কোন নতুন জনের ডাক আজও আসেনি, জীবনে আর আসবে কি না কে জানে। দেখতে সুন্দর হলেও, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অভিমানে সেই স্তোকনম্র তারুণ্য যেন বয়সের ভারে ও আলস্যে একটু নত হয়ে পড়েছে। সময় এসে পড়লে মধুবল্লীও কাঁটাগাছ জড়িয়ে ধরে। যার সময় পার হতে চলেছে, তার কাছে কান্তিকুমার তো সোনার তরুয়ার চেয়েও বেশী। এত ভাল ছেলে কান্তিকুমার!

জয়ার বাবা প্রতাপবাবু বলতে গেলে কিছুই রোজগার করে না, অথচ চলে যায় একরকম, কারণ কান্তিকুমার নামে এক উপকারের মহাজন যে সহায় আছে।

কান্তিকুমার প্রতাপবাবুর কেউ নয়। দু'বেলা ছেলে পড়িয়ে, আট ঘণ্টা হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে কলম পিষে কান্তিকুমার যা রোজগার করে, তার উত্তমাংশ সবই প্রতাপবাবুর সংসারের শত রকম দাবির যোগ দিতেই ফুরিয়ে যায়। কৃচ্ছ্র উপার্জনের মাত্রা এতটা

টান সইতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ধার করতে হয় কান্তিকুমারকে। ধার শোধের সংস্থান করতে গিয়ে হয়তো তৃতীয় একটা ধুতি কেনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়। বর্ষার মেঘের মতই কান্তিকুমারের মনটা, পরের জন্য সমবেদনায় গলে পড়ছে, নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে।

প্রতাপবাবুর নাকি এককালে খুব ভাল অবস্থা ছিল। প্রবাদ আছে, সোনার ছিপে মাছ ধরতেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ছিপটা বাঁশেরই ছিল, হুইলটা ছিল সোনার তৈরী। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মুনসেফ আদালতের বারান্দার এক কোণে দোয়াত কলম নিয়ে বসেন। দু'-একটা দরখাস্ত লেখার কাজ পেয়ে যান। আট দশ আনা যা আসে তাই লাভ।

এক একদিন ধারের ফিকিরে বের হয়ে হয়তো অনেক রাত্রে ঘরে ফেরেন প্রতাপবাবু। জয়া জেগে বসে থাকে। খেতে বসে গম্ভীর হয়ে প্রতাপবাবু বলেন।—শ্রীনিবাস আজ আমায় অপমান করেছে, জয়া।

জয়া—কেন?

—কিছুই কারণ নেই। গায়ে পড়ে উপদেশ দিল, কান্তির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্য।

জয়া চুপ করে থাকে। শ্রীনিবাসবাবুর উপদেশের মধ্যে অপমানের প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে মনে মনে হেসেও ফেলে।

প্রতাপবাবু নিজের মনে বলতে থাকেন।—কান্তি ছেলেটির হৃদয় খুব মহৎ সন্দেহ নেই। নিজে দারুণ অভাবে থেকেও দরকারের সময় চাইতেই দু'চার টাকা ধার দিয়ে দেয়। তবে সবই তো শোধ করে দেব একদিন। তাই বলে ওর সঙ্গে প্রতাপ রায়ের মেয়ের বিয়ে? কি যে বলে। শ্রীনিবাসটা একটা স্টুপিড।

খাওয়া শেষ হলে, হাত মুখ ধুয়ে, পান চিবিয়ে একটা ছেঁড়া কৌচের ওপর নতুন চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাকেন প্রতাপবাবু।

সিগারেটের নতুন টিনটা খোলেন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে আর একটা মিঠে-পচা গন্ধ ঘরের বাতাসে ভুরভুর করে ওঠে। জয়া বুঝতে পারে, প্রতাপবাবু আজ মদ খেয়েছেন। ঐ নতুন চাদর আর একটিন সিগারেট আজই কেনা হয়েছে। আজই সকালে কান্তির কাছে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছেন প্রতাপবাবু। জয়া সব খবর রাখে।

পরের দিন জয়ার সঙ্গে কান্তি একবার যখন দেখা করতে আসে, প্রতাপবাবু তখন বাড়িতে নেই। জয়া হেসে হেসে বলে—কান্তিদা, তুমি শিগগির বড় লোক হও। নইলে শেষে বড় অপমানের ব্যাপার হবে।

—কেন বলতো?

—বাবাকে তুমি এতদিন ভুল বুঝেছ, আমিও ভুল বুঝেছি। তিনি শুধু তোমার টাকা ধার নিচ্ছেন, শোধও করে দেবেন একদিন। আর কোন ভাবে তোমাকে আমল দিতে বাবা রাজী নন।

হঠাৎ জয়ার চোখ ফেটে জল দেখা দেয়। কিন্তু অভিমানিনী নায়িকার মত চুপ করে থাকার উপায় ওর নেই। তাই জয়াকে বলতে হয়—তুমি আমাকে চারদিকের এই দুর্নামের ঘেন্না থেকে বাঁচাও কান্তিদা। তুমি নিজে বড় হও, অবস্থা ভাল করে নাও। যারা আজ তোমাকে আড়ালে বদমাস বলে গালি দিয়ে বেড়ায়, তখন তারাই তোমাকে প্রেমিক বলে বাখান করবে।

যেন কৌতুক করার জন্যই মুখে হাসি টেনে কান্তিকুমার বলে—আমি এখন সত্যিই বড়লোক হয়ে আছি, জয়া। আমার কাছে নগদ দশটি হাজার টাকা আছে, তোমার বাবা কি সে-খবর জানেন?

জয়া—আমার জন্য বলবার কেউ নেই, তাই প্রাণের দায়ে বেহায়ার মত তোমাকে নিজের মুখে সব বলতে হচ্ছে। এর ওপর তুমি আর বৃথা ঠাট্টা অপমান করো না।

—বিশ্বাস কর জয়া। প্রীতির বাবা অটলবাবু টাকাটা আমার কাছে জমা রেখে গেছেন। আবার চাইতে এলে ফেরত দিতে হবে।

দৃষ্টিটা আরও গভীর করে নিয়ে কান্তিকুমারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, যেন দুর্মদ একটা আগ্রহে আকুল হয়ে জয়া হঠাৎ অনুরোধ করে বসলো—ফেরত দিও না, কান্তিদা।

—ছিঃ, ওকথা বলো না।

—পরে না হয় শোধ করে দিও, এখন টাকাটা দিয়ে একটা কারবার শুরু করে দাও।

—সেটাও অন্যায় হবে। কারবার যদি ফেল পড়ে, তখন পাপের ভাগী হবে কে?

—আমি হব। আমার জন্য তুমি এটুকু সাহস কর, কান্তিদা।

—থাম জয়া। সৎপথে থেকে কি টাকা রোজগার হয় না?

—সৎপথে থেকে তো শুধু দুর্নাম রোজগার করছো আর দিন দিন রোগা হচ্ছো। অটলবাবুর মত নরপিশাচের টাকা তুলে নিয়ে দামোদরের জলে ফেলে দিলেও পুণ্যি হয়।

—এত ঘাবড়ে গেলে কেন, জয়া? আমাদের ভালবাসা ঠিক থাকলে কেউ আমাদের ভবিষ্যত নষ্ট করতে পারবে না। ধৈর্য হারিও না। তোমার বাবারও মন বদলাতে কতক্ষণ?

জয়ার মুখ আবার করুণ হয়ে উঠলো—তুমি আমার দুঃখ বুঝতে পারলে না, কান্তিদা। বড় বেশী ভালমানুষ তুমি। ধৈর্য, সৎপথ, ভালবাসা ঠিক রাখতে হবে, বাবার মন বদলাবে, এতগুলি ছুতো মানতে গিয়েই তোমার দফা শেষ হবে, দিন ফুরিয়ে যাবে। তারপর ...তারপর আর কোন কিছুর মানে হয় না।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে গেল জয়া। জয়ার মন থেকে এই অলীক দুশ্চিন্তা আর সংশয়ের স্পর্শটুকু মুছে দেবার জন্য ছুটো

বেশি কথা বলে সান্ত্বনা দেবার সময়ও আর ছিল না। এখুনি আবার কাজে যেতে হবে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথের জীবনী।

অটলবাবু বললেন—কন্ট্রাক্টটা পাওয়া গেলে সেটা তোমারও একরকম পাওয়া হলো, কান্তি। যদি একটু খেটেখুটে দাও, তবে তোমারও কিছু লাভের পাওনা হবে নিশ্চয়। যে ভাবেই হোক, গুপ্ত ব্রাদার্সকে পথ থেকে সরাতে হবে, ওদের সঙ্গে রেট নিয়ে কম্পিটিশনে এঁটে ওঠা মুশকিল। আজকালের মধ্যেই ওরা টেণ্ডর দাখিল ক'রে দেবে। তার আগে একটা ব্যবস্থা করতেই হয়, কান্তি।

বিরক্তি চাপতে গিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে কান্তিকুমার—লোভ দেখাবেন না, অটলবাবু। আপনার সঙ্গে কারবার করে বড় মানুষ হবার কোন মোহ নেই আমার।

মুহূর্তের মধ্যে, যেন নিজের হঠকারিতার নিদারুণ ভুলটুকু বুঝতে পেরে অটলবাবুর কথাগুলি অনুতাপে পুড়তে থাকে—সত্যি, বড় লজ্জা দিলে, কান্তি। এই অধম কুলি-বুড়োর ভাষা মাপ করো, কিছু মনে করো না। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে, তোমার কাছে যদি একটু উপকার আশা না করি, তবে আর কার কাছে…।

প্রত্যুত্তরে কান্তিকুমারের কথাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে যায়—উপকারের কথা যদি বলেন, তবে অবশ্য আমি প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু আমার এমন কি সামর্থ্য আছে যে…।

অটলনাথ—আছে আছে, একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে, কান্তি। তোমার মত চরিত্র আর বিদ্যেবুদ্ধি, যা ছোঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে। নইলে আমার মত গবেটের কি সাধ্যি আছে যে, বিজিনেস্ করতে পারি? না কান্তি, আমাকে এই উপকারটুকু তোমার করতেই হবে।

কান্তিকুমার চুপ করে ছিল। ভদ্রলোকের ছেলে কান্তিকুমার, মনের মাটিটা তাই খুব নরম। সামান্য বর্ষাতেই ভিজে কাদা হয়ে যায়। অটলনাথের আবেদনটাও এইবার তাই ঠিক যায়গা বুঝে অঝোরে ঝরে পড়লো—এটা আমার বুড়ো বয়সের একটা শখ, একটা ব্যামো মাত্র, কান্তি, কারবার করবো। তুমি শুধু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একটু পথ দেখিয়ে দেবে, শুধু দুটো পরামর্শ, এক-আধটা পলিসি, একটুখানি প্যাঁচ, আর একটু…।

একটা প্রসন্নতার উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে হেসে ফেললো কান্তিকুমার। অটলনাথ বললেন—এর জন্য তোমাকে কোন দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোন দিন তোমাকে সম্মানী হিসাবে কিছু দিতে যাই, হাত তুলে তোমাকে নিতেই হবে কান্তি। জেন, সেটা আমার আশীর্বাদ, আমার দেওয়া উপহার মাত্র। যদি সর্বস্ব দিয়ে ফেলি, তাও তোমায় নিতে হবে। প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে।

কান্তিকুমার বলে—আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?

কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাসের স্নিগ্ধতা ছিল।

আশ্বাসটা সর্বসংশয়ের কুহেলিকা ঘুচিয়ে প্রখর ভাবে জ্বলে উঠলো ক'টি মাসের মধ্যেই। দেখা গেল, কন্‌ট্রাক্টর অটলনাথ ছোট একটি অফিস খুলেছেন। একটি দারোয়ান আছে। আর আছে কান্তিকুমার। কান্তিকুমার শুধু পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে ঘৃণা করে না। উপকারের সুগ্রীব কান্তিকুমার সহায় হয়েছে অটলনাথের।

সূর্যপুরা থেকে চৌধুরীঘাট, নতুন সড়ক তৈরীর কন্‌ট্রাক্ট। কম করে ত্রিশটি হাজার টাকা মুনাফা থাকবেই।

অটলনাথ বললেন—ওয়ার্কস অফিসের হেড কেরানীকে আগে বাগাতে হবে।

কান্তিকুমার এক সন্ধ্যায় হেড কেরানীকে ঘুষ পৌঁছে দিয়ে এল, সাতশো টাকার নোটের একটি তাড়া।

অটলনাথ বললেন—গুপ্ত ব্রাদার্সের মেজ গুপ্তকে বিগড়ে দিতে হবে।

কান্তিকুমার দু'বোতল হুইস্কি নিয়ে মেজ গুপ্তকে নয়াবাজারের গলিতে একটা ঘর চিনিয়ে দিয়ে এল।

অটলনাথ মাঝে মাঝে হঠাৎ অফিস ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে, পরমুহূর্তে পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়েন। পাওনাদার আসছে। কান্তিকুমার নীলকণ্ঠের মত পাওনাদারের যত কটূক্তি আর অপমানের বিষ হজম করে। নিঃসঙ্কোচে বলে দেয়—অটলবাবু নেই, কলকাতা গেছেন।

এইসব দুষ্কৃতির কলুষ কান্তিকুমারের মন স্পর্শ করতে পারে না। সে যেন তার বিবেককে আলগোছে সরিয়ে রাখতে পারে। কান্তিকুমার জানে, এই কারবারের অধিকর্তা হলেন অটলনাথ, সে নিজে উপদেষ্টা মাত্র। অটলনাথের কারবারী অভিযানের সকল কুটকীর্তির দূত মাত্র কান্তিকুমার। শুধু দৌত্যের সম্মানীটুকুই তার প্রাপ্য এবং তাতেই সে তৃপ্ত। এর ওপর তার কোন দাবী নেই। বিবেকে বাধে।

কিন্তু অটলনাথ প্রতি মাসে কান্তিকুমারকে অতি নিয়মিত ভাবে পনেরটি করে টাকা সম্মানী দিতে ভুল করেন না। এই সম্মানীটা কিন্তু মজুরীর চেয়ে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট। একটা খট্‌কা লাগে মনে, কিন্তু পরমুহূর্তে কান্তিকুমারের নীতিমুগ্ধ মনের সব সংশয়ের ভার একটি যুক্তির আঘাতে লঘু হয়ে যায়—হলোই বা মজুরী। চাকরি বললেও ক্ষতি কি? যে মাঝি ডাকাতকে খেয়া পার করে দেয়, তার কি দোষ? মাঝি শুধু খাটুনির মজুরী পায়, লুঠের ভাগ তো পায় না। তাই তো সে পাপের ভাগীও হয় না

প্রতাপবাবু নামছেন, আর অটলনাথ উঠছেন। ঐ দুয়ের মাঝখানে শুদ্ধাচলে স্থির হয়ে আছে একটি ভদ্রলোকের-এক-কথার মূর্তি—কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

জয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—প্রীতির বাবার কারবারে তুমি নাকি চাকরি করছো?

কান্তি—হ্যাঁ, ওখানে চাকরি করাই ভাল। যা কেলেঙ্কারি আরম্ভ করেছেন অটলবাবু, ওর মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।

জয়া -আশ্চর্য করলে তুমি। চাকরি করলে কি জড়ানো হলো না?

—না, আমি তো কারবারের লাভের ভাগীদার নই। কাজেই পাপের ভাগীদারও হব না। তা ছাড়া, অটলবাবুর অদৃষ্টে কখন্ যে হাতকড়া পরবার ডাক এসে যাবে, কে জানে? তার ভাগীদারও আমি হতে চাই না।

—আমি যদি আজ কান্তি হতাম, তা হলে অটলনাথকে ডুবিয়ে দিয়ে কারবারটা নিজে বাগিয়ে নিতাম। আমার কাছে সেটাই একমাত্র পুণ্য কাজ হতো।

জয়ার মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠে। কান্তির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জয়ার চোখ দুটো একটা অসহ ক্ষোভের জ্বালায় ফুটতে থাকে—আচ্ছা, অটল বুড়োকে ঠকাতে না পার, আর এক বুড়োকে পারবে?

—কাকে?

—আমার বাবাকে।

—সে কি কথা? তোমার বাবাকে ঠকাবো কেন?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চল, কান্তিদা। আমি এখানে আর থাকতে চাই না। চল, কাউকে না বলেই আমরা দু'জন কোথাও চলে যাই।

মরমে মরে গিয়ে কান্তিকুমার বলে—নিজেকে এত ছোট করে

ফেলছো কেন জয়া? ভুল করো না। অধীর হওয়াই ভালবাসার প্রমাণ নয়। প্রতীক্ষার জোরেই ভালবাসা বড় হয়। তুমি আমার কথাটা একবার ভেবে দেখছো না, জয়া? দেখছো না, কত দুঃখ দুর্নাম পরিশ্রম সহ্য করে দিনের পর দিন শুধু তোমারই জন্য……।

—দোহাই তোমার, একবারটি তুমি সব সহ্য ধৈর্য হারিয়ে আমার কাছে এস। আমাকে জোর করে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চল। আমাকেআর অপমান করো না, কান্তিদা।

—একটু ধৈর্য ধর, জয়া।

ঘন শিশু গাছের আড়ালে অটলনাথ বসু চৌধুরীর বাড়িটাকে দূর থেকে কোন বাদশাহী মহল বলে মনে হয়। শুধু ফটকের থামে লেখা 'মরকত-কুঞ্জ' নামটাই সে-ভুল ভাঙিয়ে দেয়। আজকের কুলিরাও কত অল্পদিনের মধ্যে সেই ছাতুখেকো অটলনাথকে ভুলে গেছে, নইলে মরকত-কুঞ্জকে তারা কখনই 'রাজাবাবুর বাড়ি' বলতো না। এই বৈভবের ছবি মণিমালার স্বপ্নের দুরাশাতেও কখনো উঁকি দেয় নি। মণিমালা ফুরিয়ে গেছেন অনেক দিন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে-সংসারের দুঃখী নটে গাছটিও কবে মুড়ে গেছে। এখন আরম্ভ হয়েছে একেবারে নতুন করে। হলঘরে গজদন্তের ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিংয়ের মণিমালা নিষ্পলক চোখে এই কাঞ্চনপুরীর সীমাহীন প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক্ হয়ে রয়েছেন।

লোকে কত ভাবে জল্পনা-কল্পনা করেছে, কিন্তু আজও কেউ কিছু ঠাউরে উঠতে পারে না, কি করে অটলবাবু হঠাৎ এত ফেঁপে উঠলেন? কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার গল্পকেও বিস্ময়ে ছাপিয়ে উঠেছে। শতবাহু বিস্তার করে এগিয়ে চলেছে অটলবাবুর প্রতিভা। মান-সম্পদের আকাশে যতগুলি চাঁদ-সুরুজ-তারা আছে সবই যেন তিনি

পুষে নেবেন। এরই মধ্যে দশটা জয়েন্ট স্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্সীর টুপি তাঁরই মাথায় এসে ভিড় করেছে, আরও আসছে। গালা রেশম অভ্র চা আর টিম্বার—এই ছয়টি পণ্যের ছয়টি রপ্তানী কারবারের ষোল আনা মালিকানা অটলবাবুকে প্রায় চাঁদসদাগর করে ফেলেছে। অটলনাথ স্বয়ং একটি উপ-ভগবান, এক হাজার কুলি, কেরানী ও কারিগরের অন্নবিধাতা।

শিবাজী উৎসবে এক হাজার লোকের সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক জনহিতৈষী অটলনাথ বক্তৃতা করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না।— 'বাণিজ্যে বসতে মুক্তি! দেশবাসীর কাছে আমার এই একমাত্র বাণী। মহারাজা শিবাজীর আদর্শকে যদি আজ সার্থক করতে চাই, তবে বাণিজ্যের গেরুয়া ঝাণ্ডা আবার তুলে ধরতে হবে। জয়তু শিবাজী।'

করতালির শব্দে সভার উল্লাস চিড়বিড় করে ফুটতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য ঘুম হয় না, এই রকম ছুটো খবরের কাগজে এক হাত লম্বা শিরোনামা ফলিয়ে অটলনাথের ভাষণ ছাপা হয়।

কান্তিকুমার প্রত্যহ অটলবাবুর লাইব্রেরী ঘরে একবার হাজিরা দিয়ে যায়। অটলবাবুর লাইব্রেরী? কথাটা শুনতে আজ আর কারও কানে খট্‌কা লাগে না। সেদিন আর নেই। অটলবাবু ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখছেন—একথা বললেও সহসা কেউ অবিশ্বাস করে ফেলতে পারবে না। ভাগ্যের ছাপ্পর ফুঁড়ে রূপোবৃষ্টি হবার আগে, জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর যে-মানুষ শুধু কথামালা, কাকচরিত্র আর পঞ্জিকা ছাড়া কোন পুঁথির পাতা উল্টে দেখেন নি, তাঁরই প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে সারি সারি মেহগনির আলমারি আর মরক্কো-বাঁধাই বই। জ্ঞানকুসুমের একটি ভরা মালঞ্চ—তারই মালাকর হলেন অটলনাথ।

বাইরের লোকে জানে, কান্তিকুমার হলো অটলনাথের প্রাইভেট

সেক্রেটারি। অটলনাথও তাই বলেন। এটা হলো কান্তিকুমারের পোশাকী পরিচয়। কিন্তু ঘরে যখন কেউ থাকে না; শুধু দু'জনে মুখোমুখি বসে, তখন অটলনাথ বেশ সমীহ করে, বেশ একটু অন্তরঙ্গতার সুরে সেই আটপৌরে নাম ধরেই ডাকেন—তা হলে বলতে হয় কান্তি মাস্টার......।

এই সেক্রেটারিগিরি তথা মাস্টারিগিরির জন্য মাসিক বিশটি টাকা দক্ষিণা পায় কান্তিকুমার।

সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত রহাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে হিসেব কষে কষে কান্তিকুমারের মাথার ভেতর পিস্টনগুলি যখন ক্ষয়ে গিয়ে ঝিমঝিম করতে থাকে, ঘাড়ের কাছে স্নায়ুর গিঁটগুলিতে স্পার্কের শক্ লাগে, বুকের ভেতর ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসে—তখন ছুটি হয়। ঘরে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে, দুটো রুটি চিবিয়ে এক গেলাস জল খায়; নিস্তেজ মনুষ্যত্বের ইঞ্জিনটা তখন বোধ হয় একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপরেই এক অভিনব মাস্টারির পালা, প্রায় রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

লাইব্রেরী ঘর। টেবিলের মুখোমুখি দু'জনে বসেন। অটলনাথ বলেন—কিছু একটা পড়ে শোনাও দেখি মাস্টার।

হাত বাড়িয়ে যে-বইটা পেল এবং খুলতেই যে-পৃষ্ঠা দেখা দিল, গ্রামোফোনের মত সেখান থেকেই পড়া শুরু করে দিল কান্তিকুমার। —জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি সর্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব......

পড়া সামান্য অগ্রসর হয়েছে, অটলনাথ মাথা দোলাতে লাগলেন। বোঝা গেল, এটা একটা আপত্তির সঙ্কেত—উঁহু হলো না। এ যে কিছুই বাগিয়ে বলতে পারছে না, মাস্টার। গোড়াতেই ভুল করে ফেললো।

কান্তি—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। এ বইটা রেখে দিই, কি বলেন?

—কি নাম বইটার ?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

—কে লিখেছে ?

—বঙ্কিমচন্দ্র।

—কি দুঃখের কথা! শেষে কিনা বঙ্কিম পর্যন্ত একটা সাদা কথা ধরতে পারলে না, মাস্টার ?

অটলনাথ তাঁর কাঁচাপাকা রোমশ ভুরু দুটো টান করে সত্যিই আক্ষেপ ক'রে বলেন—না মাস্টার, অন্য একটা ধর। একটু ইতিহাস শোনাও।

কান্তিকুমার ইতিহাসের বই নিয়ে বসলো। পড়া আরম্ভের আগেই অটলনাথ অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেললেন—বঙ্কিম কি রকম ইয়ে জমিয়ে ছিল, কিছু খবর রাখ মাস্টার ?

—বুঝলাম না, স্যার।

—ক্যাশ হে ক্যাশ, যাকে বলে নগদ নারায়ণ।

—আজ্ঞে না, সে খবর ঠিক জানি না।

—এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজারের বেশী হবে কি ?

—এত নগদ টাকা কোথায় পাবেন বঙ্কিম চাটুয্যে ?

—তাহলেই বোঝ মাস্টার! এত বিদ্যেসিদ্যে নামডাক পসার সব বৃথা হলো না কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি এখন বুঝতে পারছো, বিদ্যে জিনিসটা বই ঘেঁটে পাওয়া যায় না ? ভগবান যাকে পাইয়ে দেন, সেই পায়। কি বল ?

—ঠিক কথা। আকবর বাদসাহ ক-খ জানতেন না, কিন্তু এদিকে…

—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলে, ধর আমারই কথা, এতখানি বিদ্যে এমনি এমনি পেতাম কি ?

—আপনার কথায় কোন ভুল নেই, স্যার।

সত্যি কথা, অটলনাথের কোথাও কোন ভুল হয় নি। গোরক্ষা সমিতি থেকে শুরু করে আদি ভারত প্রত্নশালা পর্যন্ত, সর্ব ঘটে তিনি বিরাজ করছেন। কোথাও সদস্যরূপে, কোথাও সচিব রূপে এবং কোথাও কোথাও প্রেসিডেণ্ট ও পেট্রনরূপে। গত পয়লা বৈশাখেও সুরাপান নিবারণী সভার বার্ষিক বিবরণ তিনিই পড়েছেন।

কিন্তু জয়নগরের ডিস্টিলারিটার ডাক হবে আসছে মাসেই। বদলী হয়ে নতুন এক আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও এসেছে। অটলনাথ বললেন—ইতিহাস পড়া এখন রেখে দাও, মাস্টার। আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে একটি জলসা দিতে হবে। বেশ গুছিয়ে একখানা অভিনন্দন লিখে ফেল দেখি।

অটলনাথের বোধ হয় ভুল হচ্ছে, অথবা অন্য কাউকে অভিনন্দন জানাতে চান। আন্দাজে ধারণা ক'রে নিয়ে কান্তিকুমার বলে—আবগারী সুপারকে আপনি অভিনন্দন জানাবেন কেন?

—জয়নগর ডিস্টিলারির ডাক হবে হে মাস্টার। এই বছরটার জন্য আমিই ডেকে নিতে চাই। এক বছরে কত প্রফিট জান?

—কিন্তু স্যার, লোকে যে আড়ালে নিন্দে ক'রে বলবে, শেষে কিনা অটলনাথের মত জনহিতৈষী মদের ভাঁটির ঠিকে নিল?

—আমার বদলে যদি রায় সাহেব বৃদ্ধিচাঁদ ডিস্টিলারিটা ডেকে নেয়, তাহলেই বুঝি খুব জনমঙ্গল হবে? বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকার প্রফিট অবাঙ্গালীর হাতে গিয়ে পড়ুক, তোমরা বুঝি তাই দেখ্‌লে খুশী হও?

অটলনাথ চোখ পাকিয়ে কথাগুলি বললেন। কান্তিকুমারের আর কিছু উত্তর দেবার মত যুক্তি ছিল না। অটলনাথের বাণিজ্য-সাধনার পুঞ্জ পুঞ্জ মুনাফা বাঙালীর জাতীয় রাজকোষ ফাঁপিয়ে তুলছে, চুপ করে কলমের নিব খুঁটে খুঁটে এই বিশ্বাসটাকেই বোধ হয় খতিয়ে দেখতে থাকে কান্তিকুমার।

ঘড়ির কাঁটার মুখে বর্ষার রাত্রি বারোটার দিকে ঠেলে ওঠে। কান্তি হাই তোলে, চোখের পাতা শিথিল হয়ে আসে, পেটের নাড়ীতে ক্ষুধার ইশারা মোচড় দেয়। তবু কান খাড়া করে থাকতে হয়, অটলনাথের কোন প্রশ্নের উত্তর যেন ফস্‌কে না যায়।

অটলনাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন—কই, তুমি আমার কথার কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কান্তি মাস্টার যেন তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে একেবারে গলে পড়লো—মাপ করতে আজ্ঞা হয় স্যার। আমি আপনার মত ওভাবে তলিয়ে দেখিনি। তিন বছরের জন্য ডিস্টিলারিটা ডেকে নিলে হতো না স্যার?

—আপাতত, হুঁ। অটলনাথ ঢেঁকুর তুলে থেমে গেলেন।

অটলনাথের মুখের চেহারা থেকে ক্ষণেকের রুষ্ট অন্ধকার আবার ফরসা হয়ে গেল। কান্তিকুমারও নিশ্চিন্ত হয়ে ছাতাটা হাতের কাছে টেনে নেয়।

অটলনাথ বলেন—আর একটা কথা আছে মাস্টার। চিঠিপত্রে বিজ্ঞাপনে নোটিশে বা রিপোর্টে, আমার নামটা আর ওভাবে লিখবে না। এবার থেকে নামের আগে 'বাণিজ্যবীর' কথাটা বসিয়ে দেবে। বাণিজ্যবীর অটলনাথ, বুঝলে? ভুল হয় না যেন।

—যে আজ্ঞে।

কান্তিকুমার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অটলনাথও উঠে দাঁড়িয়ে আর একটা কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন—জীবনীটা এইবার লিখতে শুরু করে দাও মাস্টার। জিনিসটা যেন ভাল হয়, তা হ'লে তোমাকেও খুশী করে দেব। একেবারে এক সঙ্গে নগদ-নগদ হাতে হাতে মোটা রকমই কিছু পেয়ে যাবে।

ক'দিন থেকে জয়ার জ্বর হয়েছে। প্রতাপবাবু দিনে দু'বার করে কান্তিকুমারের কাছে টাকার তাগাদায় আসছেন। টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। একদিন দুদিন—তিন দিন। প্রতাপবাবুকে খালি-হাতে ফিরে আসতে হলো সেদিন। কান্তিকুমারের অর্থের সঙ্গতি একটি চাপেই খতম হয়ে গেছে। ধার করারও আর কোন নতুন আশ্রয় নেই।

জীবনে এই প্রথম কান্তিকুমারের পায়ের তলার মাটি চোরাবালির মত নরম হয়ে গেল। তার সকল আশ্বাস যেন এই একটি ঘটনায় নির্ভর হারিয়ে ফেলেছে। জয়াকে শুধু উপকারের ডোরে বেঁধে রেখেছিল কান্তিকুমার। যদি সেই বাঁধন একবার ছেঁড়ে, তবে ছিঁড়েই গেল বোধ হয়।

জয়ার কাছে মুখ দেখাবে কি করে? এক অমোঘ সুসময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়ার ভালবাসার অধৈর্যকে এতদিন বেঁধে রেখেছে কান্তিকুমার। আজ এসেছে দৈবের উৎপাত। টাকার অভাবে জয়ার চিকিৎসা হবে না। জ্বরের ঘোরে হেসে উঠবে জয়া। তার ভালবাসার মুরোদ ধরা পড়ে যাবে জয়ার কাছে।

টাকা চাই। রাত জেগে অটলনাথের জীবনী লিখছে কান্তিকুমার। অন্তঃসার আর নেই বোধ হয়, মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। দুটো নিদ্রাহীন আতঙ্কিত চোখ খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকে। একটা নির্লজ্জ কলম ক্লান্তিহীন মোসাহেবী-আনন্দে পাতা ভরে ভরে এক অত্যুচ্চ সততার ইতিহাস লিখে যায়—অটলনাথের জীবনী। এ ছাড়া আর কোন্ পথ আছে কান্তিকুমারের?

মাস্টারীরও কামাই নেই। অটলনাথ সেদিন বললেন—মেয়ে স্কুলের প্রাইজের বক্তৃতাটা একটু ফলিয়ে লেখ মাস্টার। আজকাল প্রগতির কথা যা' সব শুনছি, সেসব কিছু কিছু দিও। বেশ একটু আর্ট করে লিখবে, রবিঠাকুরের মত।

কান্তিকুমার আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশটা বুঝবার জন্য উৎসুকভাবে

অটলনাথের দিকে তাকিয়ে রইল। অটলনাথ বললেন—বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন পথ নেই, এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে হবে। সেই সঙ্গে বেশ কড়া করে নিন্দে করতে হবে—লোকে কেন ঘরে ঘরে ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়ে পুষে রাখে? এটা অধর্ম, এ'তে জাতিলোপ হবার আশঙ্কা আছে।

কান্তি।—যে আজ্ঞে।

অটলনাথ।—হ্যাঁ, আর একটি কথা লিখবে। পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের গতি নেই। সেই অভিভাবক বাপই হোক্ বা স্বামীই হোক্ বা···বা যেই হোক্।

তেমনি নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছিল কান্তিকুমার। অটলনাথ আবার বললেন—ভাষাটার দিকে একটু নজর রেখে লিখবে, মাস্টার। খারাপ করো না। অবিশ্যি, তোমার ভাষা যতই খারাপ হোক, আমি আমার পড়ার গুণেই কেমন জমিয়ে দিই, সে তো তুমি জান।

কান্তি।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অটলনাথ একবার পাশের ঘরে উঠে গেলেন। মিনিট পনের সেখানেই কাটলো। ফিরে এলেন যখন, তখন মুখের চেহারা বদলে গেছে। লালচে হয়ে গেছে, আগুনের আঁচ লাগলে যেমন হয়।

চেয়ারে বসে ছেলেমানুষের মত উসখুস করতে লাগলেন অটলনাথ। কান্তিকুমারের কাছে এই দৃশ্য একেবারে নতুন নয়। এক পাত্র স্কচ হুইস্কি পেটে পড়লে অটলনাথের হাবভাব এই পরিণত বয়সেও একটু দুরন্ত হয়ে ওঠে।

—কই, বক্তৃতাটা কি রকম লিখলে দেখি মাস্টার। একবার পড়ে শোনাও।

অটলনাথ সোফার ওপর শরীর এলিয়ে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিবেটা কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিলেন।—একটা তুলে নাও মাস্টার, লজ্জা করো না। আমেরিকার ক্রোড়পতি মালিকও চাকরানির

সঙ্গে নাচতে দ্বিধা করে না, আমি তো তোমাকে বিশুদ্ধ একটি সিগারেট দিচ্ছি। নাও, নিয়ে ফেল।

কান্তিকুমার একটা সিগারেট তুলে নিয়ে খাতাপত্রের এক পাশে রেখে দিয়ে লেখাটা পড়তে থাকে।—আজ তোমরা ছাত্রী, কুমারী। কাল তোমরা গৃহিণী হইবে, মাতা হইবে। সেইতো জীবনের চরম সার্থকতা। তোমরা সেই জগন্মাতার অংশ, যাঁহার করুণার স্তন্যক্ষীরধারায় নিখিল বিশ্বের জীব লালিত হইতেছে…বন্দে মাতরম্।

দু'ঠোঁটে লহু লহু হাসি। ঝুঁকে-পড়া মাথাটা সোজা করে তুলে ধরলেন অটলনাথ।—বাঃ, খুব কায়দা করে বেড়ে সব দেহতত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়েছ, মাস্টার! চমৎকার হয়েছে।

আহ্লাদে আপ্লুত স্বরে কথাগুলি বললেন অটলনাথ। কান্তিকুমার হাবা ছেলের মত হাঁ করে তাকিয়ে তার মর্ম বোঝার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। চোখ বুঁজেই অটলনাথ আবার ডাকলেন—মাস্টার!

—আজ্ঞে।

—প্রতাপের বড় মেয়েটা বেশ বয়স্থা হয়েছে, নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—প্রতাপের তো এমনিতেই পেট চলে না, মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্যি ওর নেই। নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের রাঁচী অফিসে প্রতাপকে একটা কাজ দিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করে দিলাম। গালার স্টোরের মেড়ো মুন্সীটাকে বিদেয় করে দিয়ে প্রতাপকে বসিয়ে দেব তার জায়গায়।

—ভালই হল স্যার!

—প্রতাপ তো রাঁচী চললো। কথা হচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা কোথায় থাকবে? আপাতত আমার এখানেই থাকবে। কি বল মাস্টার?

উদ্দাম কাশির মধ্যেই ফিক করে হেসে ফেললেন অটলনাথ।

—আর একটা সিগারেট নাও মাস্টার। ডিবেটা সাগ্রহে কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অটলনাথ আবার বললেন—প্রতাপটা যেন ঝড়ের আগে এঁটো পাতা। বলা মাত্র রাজী হয়ে গেছে। কালই কাজে জয়েন করতে চায়।

বলতে বলতে অটলনাথের গলার স্বর বিলোল হয়ে উঠতে থাকে। —মেয়েটাই বা কি কম যায়? এরই মধ্যে চারটে চিঠি ছেড়েছে, তার সঙ্গে ডাক্তারখানার ওষুধের বিল, বকেয়া বাড়ি ভাড়ার হিসাব, কাপড়ওয়ালার বিল, স্যাকরার পাওনা…। চুকিয়ে দিয়েছি সব। অসুখ সারানো থেকে শুরু করে গয়না পর্যন্ত গড়ে দিলাম! মেয়েটা কিন্তু বাপের মত ততটা তোখোর নয়।

আহত জানোয়ারের মত আচম্‌কা হিংস্র মূর্তি ধরে, একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার উপর পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে লালসায় কাতরাচ্ছে। মাথার ওপর প্রচণ্ড একটা বাড়ি দিয়ে এই অজগরের জীবনীর শেষ অধ্যায় এখুনি লিখে দিতে পারা যায়। কান্তি মাস্টার নয়, যেন হিংস্র এক খুনী ছুরি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তবু এই মূর্তিতে কান্তিকুমারকে কেমন একটু বিসদৃশ মনে হয়, যেন অভিনয় করার জন্য একটা ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

অটলনাথ বললেন—উঠোনা মাস্টার। কথা আছে।

কান্তিকুমারের উদ্ধত মূর্তিটা এই সামান্য একটি হুকুমের শব্দেই যেন সেই মুহূর্তে চুপ্‌সে যায়। সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কার-প্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর আবার একেবারে সুস্থির হয়ে বসে। এখন তবু কান্তিকুমারকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।

অটলনাথ বললেন—প্রতাপটা প্রথমে একটু চালাকি চেলেছিল। বলে কিনা, তার মেয়েকে বিয়ে কর, আমি নাকি সাক্ষাৎ শিব। আমি

বললাম, তা হয় না। অন্নদাতা হিসেবে তার মেয়েকে রাখতে পারি, বিয়ে করতে পারি না।···আচ্ছা এবার তুমি উঠতে পার, মাস্টার।

নির্দেশমাত্র কান্তিকুমার যেন সুবাধ্য টাট্টু ঘোড়ার মত খুট্ খাট্ খুরের শব্দ ক'রে দরজার দিকে পা চালিয়ে চলতে থাকে। অটলনাথ ডাক দিলেন আবার—আর একটা কথা আছে, মাস্টার।

কান্তিকুমার দাঁড়ায়।

অটলনাথ বললেন—বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয়, মাস্টার আর ভাল লাগে না। ওটা বদ্‌লে দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্য ঋষি।

হঠাৎ গোধূলি

ওদের দু'জনকে পাশাপাশি একসঙ্গে দেখলে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়। অলকা আর প্রশান্ত যেন একই ছন্দে একই কবিতার দুটি চরণের মত মিলে গেছে। দুজনে পাশাপাশি থাকলে তবেই ওদের দুজনকে এত সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালের জলভরা পুকুরের পাশে একটি পুষ্পিত ঝুমকো জবার গাছের মত, ওরা নিজের গুণেই যেন পরস্পরকে রূপ ধার দিয়ে এতটা সুন্দর করে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে। নইলে, শুধু একটা জলভরা পুকুর কিই-বা এমন সুন্দর! একটা ঝুমকো জবার গাছের একলা রূপের মধ্যে তাকিয়ে দেখবার মত এমন কিই-বা আছে?

বিয়ের পরেই আগ্রাতে বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। তাজমহলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একজন অ্যামেরিকান টুরিস্ট আচমকা সামনে এসে দাঁড়ালো। ইশারায় অনুরোধ জানালো—এক মিনিটের জন্য একটু থেমে থাকতে। ক্লিক্ ক্লিক্! উৎফুল্ল পাখির মত টুরিস্টের ক্যামেরা যুগল-রূপের দিকে তাকিয়ে একবার ডেকে উঠলো।

চৌরঙ্গীতে বাসের প্রতীক্ষায় ওরা দুজনে একটা স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'একটা বেহায়া টমি একরোখা কেউটের মত শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসে। একেবারে সামনে এসে পড়তেই, অলকা ও প্রশান্ত একসঙ্গে তাকায়। কেউটে টমি চকিতে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। দূরে এগিয়ে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভীরু চোখ তুলে দেখে—কালা আদমির দেশে কোন শিল্পী যাদুকরের তৈরী একজোড়া মোহ যেন পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু চেহারার জন্য নয়, শুধু গুণ মান শিক্ষা ও বিত্তের জন্য নয়,

ওরা সব চেয়ে সুখী ওদের ভালবাসার জন্যই। এই ভালবাসাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন ছলনা আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।

সুতরাং, নিজের সম্বন্ধে প্রশান্তের ধারণা যদি তার মনের ভেতর একটি সুশোভন স্পর্দ্ধায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তবুও তাতে দোষ দেওয়া যায় না। অলকা যদি আত্মবিশ্বাসে একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠতে থাকে, তবে তাতে নিন্দে করার মত বিশেষ কিছু থাকতে পারে না।

প্রশান্ত এক এক সময়ে বলে—অলকা, তুমি কল্পনা করতে পার, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তার হাতটা এভাবে তোমার গলা জড়িয়ে আছে !

অলকা প্রশান্তের হাতটা সজোরে টেনে নামিয়ে দেয়—এরকম বিশ্রী কথা বলবে তো আমায় ছুঁতে পাবে না।

প্রশান্ত হাসতে থাকে। তার সুপুরুষতার মূল্য আর মর্যাদা অলকার কাছে মাঝে মাঝে এইভাবে নেহাৎ রসিকতার ছলেই সে যাচাই করে নেয়। অলকা রাগ করে, কিন্তু প্রশান্তের বেশ লাগে।

প্রশান্তের একবার জ্বর হয়েছিল। একটী নার্স রাত জেগে প্রশান্তকে শুশ্রূষা করতো। নার্সটি দেখতে সুন্দর, তার ওপর বেশ ভদ্র আর লাজুক। ওষুধ খাওয়াবার সময় নার্স প্রশান্তের মাথাটা একটা হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতো। নার্সের আগ্রহ ভরা দু'চোখের দৃষ্টি প্রশান্তের মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতো। অলকা সবই দেখতো, তবু তার মনের কোণে কোন মেয়েলী অভিমানে একটুও অস্বস্তির খোঁচা লাগতো না। অলকার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অলকা জানে, প্রশান্তের মনে একতিল জায়গাও আর খালি পড়ে নেই। সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে স্বয়ং অলকা।

প্রশান্তের সঙ্গে বের হয়ে, পথে ট্রামে বাসে কতবার কত সত্যিকারের রূপসী চোখে পড়েছে অলকার, কিন্তু অলকা দেখেছে, প্রশান্ত তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

দেশ বিদেশের নাম-করা অ্যাথলেটদের ছবির একটা অ্যালবাম এনে একদিন প্রশান্ত অলকাকে দেয়।—নাও, বসে বসে দেখ। এক একটি চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

অলকা অ্যালবামটা একবার উল্টিয়ে দেখেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—ভারী সব ছিরি! এসব দেখবার কোন গরজ নেই আমার, তোমার সাধ থাকে তুমি দেখ।

প্রশান্তর চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি, এবং সেই সঙ্গে একটু গর্বও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই রসিকতাগুলি নেহাৎ তুচ্ছ, কিন্তু তার মধ্যে যেন এক পরম বিশ্বাস বার বার পরীক্ষায় মাজাঘষা হয়ে খাঁটি সোনার মত আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই প্রশান্ত এত খুশী! প্রশান্তের আত্মশ্রদ্ধা অলকার সমাদরের জলবাতাসে সতেজ চারাগাছের মত উর্ধ্বে মাথা ঠেলে উঠছে। সুন্দরী অলকার কাছে পৃথিবীর সব পুরুষ মিথ্যে, রূপেগুণে, ব্যক্তিত্বে ও প্রেমিকতায় সত্য হয়ে মাত্র একটি পুরুষ অলকার কাছে নিঃশ্বাসবায়ুর মত মনপ্রাণ ছেয়ে আছে। সে হলো অলকার স্বামী প্রশান্ত। এই উপলব্ধি প্রশান্তের কথাবার্তায় ঠাট্টায় রসিকতায় এক সবিনয় ঔদ্ধত্যের নেশা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত সেটা বুঝতে পারে না বোধ হয়। কিংবা বুঝতে পারলেও ভাল লাগে।

প্রশান্তকে যদি পুরুষোত্তম বলা যায়, তবে প্রশান্তের বন্ধু শঙ্করকে অপৌরুষেয় না ব'লে উপায় নেই। রোগা কালো টাকপড়া মাথা, কপালের ওপর চার পাঁচটা বসন্তের দাগ। জীবন বীমার দালালী করে শঙ্কর। সামান্য রোজগার। লেখাপড়া হয়তো সামান্য কিছু জানে।

শঙ্কর প্রায়ই সন্ধ্যার সময় প্রশান্তের বাড়ি একবার ঘুরে যায়। প্রশান্তের সঙ্গে অনেক পদস্থ ও সম্পন্ন লোকের জানাশোনা আছে। তাদের একটু বলে কয়ে দিলেই শঙ্কর দু'একটা জীবন বীমার মক্কেল পেয়ে যায়।

শঙ্কর করুণার পাত্র সন্দেহ নেই। প্রশান্ত তাই এই গরীব বন্ধুকে সাহায্য করতে কুণ্ঠা করে না। অলকাও তার যথাসাধ্য করে। চা-জলখাবার না খাইয়ে সে কখনো শঙ্করকে উঠতে দেয় না।

অলকা ও প্রশান্ত এক একদিন বেড়িয়ে ফিরে দেখে, শঙ্কর বৈঠকখানার ঘরে একা একা বসে আছে, রাত নটা বেজে গেছে যদিও। ওরা আসা মাত্র শঙ্কর গাত্রোত্থান করে। প্রশান্ত বলে—আরে, এতক্ষণ যখন ধৈর্য ধরে বসেই আছ, তখন আর পাঁচ মিনিট বসে যেতে দোষ কি? বসো বসো।

অলকা প্রশান্তের একটা ইশারা বুঝতে পারে। একটা ডিসে কিছু খাবার সাজিয়ে এনে শঙ্করের সামনে রাখে।

এ ছাড়া শঙ্করকে নিয়ে আর একটা ব্যাপার প্রায়ই হয়ে থাকে। হাঁসাহাসি আমোদের চর্চা।

শঙ্করকে নিয়ে প্রশান্ত প্রায়ই রগড় করে। বিয়ের পর থেকে প্রশান্তের এই খেয়ালটা আরও বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে।

এক একদিন প্রশান্তের মাথায় যেন রগড়ের ভূত এসে ভর করে। শঙ্কর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তবু অদ্ভুত এক পুলকে মাতাল হয়ে প্রশান্ত বলতেই থাকে—যদি নেহাৎ বিয়ে করতে হয় শঙ্কর, তবে প্রেম করে বিয়ে করবে। নইলে আমার মত পস্তাতে হবে।

পস্তাতে হবে। নিছক রঙ্গ করেই এত বড় একটা মিথ্যা না বলে নিলে প্রশান্ত যেন তার পরিণয়ে কৃতার্থ জীবনের সত্যটিকে চরম করে অনুভব করতে পারে না।

অলকা এসে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তের রসিকতা আরও উদ্বেল হয়ে

ওঠে—তুমি জান না অলকা, শঙ্কর এযাবৎ তিনবার প্রেমে পড়েছে। ওর দোষ নেই। নায়িকারাই মরিয়া হয়ে ওর পেছনে লেগেছিল। শঙ্করের উপেক্ষায় একটি ভগ্ন-হৃদয় তরুণী তো আজ পর্যন্ত বিয়েই করলেন না।

সবই নিছক মিথ্যা, তৈরী করা কাহিনী মাত্র। নগণ্য শঙ্করের জীবনে নিতান্তই অলীক উপকথার কতগুলি বিদ্রূপ। তবু এসব কথা ব'লে প্রশান্ত কি যে আনন্দ পায় তা সেই জানে।

অপ্রস্তুত শঙ্কর সত্যিই লজ্জায় আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। অলকা সামনে বসেই সব শুনছে, হয়তো সব বিশ্বাস করে ফেলছে। শঙ্কর প্রশান্তকে ধমকের সুরে আপত্তি জানায়—কি সব বাজে কথা বকছো প্রশান্ত? তোমার আর মাত্রাজ্ঞান নেই।

অলকার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে শঙ্কর চোখ নামিয়ে নেয়। অলকা শান্তভাবেই শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতুকে অলকারও চোখ দুটি হাসতে থাকে। একটা অধঃপতিত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দূর নক্ষত্রের দরদের মত অলকার চোখের হাসিটা যেন মিটিমিটি জ্বলে।

চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর। জীবন বীমার নতুন এক মক্কেলের ঠিকানা প্রশান্তের কাছ থেকে জেনে নিয়ে উঠে পড়ে শঙ্কর, চলে যায়।

প্রশান্ত একদিন বললো—তোমার সৌভাগ্যের চন্দ্রকলা এতদিনে পূর্ণ হলো অলকা।

অলকা—কি হলো?

—তুমি মনে করেছ, শঙ্কর এখানে শুধু খাবার খেতে আর জীবন বীমার মক্কেলের খোঁজ নিতে আসে?

—তা মনে করবো কেন? তোমার বন্ধু মানুষ, তুমি ওকে ভালবাস তাই আসে।

—না গো বিশ্বমনোরমা, তোমাকেই দেখতে আসে।

—কি যে বল! এরকম বিদ্‌ঘুটে কথা আর বলো না, আর যা-ই বল।

প্রশান্ত যেন এতদিনে তার কল্পনার মধ্যে আর একটি প্রচণ্ড প্রহসন তৈরী করেছে। হাসি থামাতে পারে না প্রশান্ত।

প্রশান্ত প্রস্তাব করে—একটা মজা করতে হবে অলকা। তোমাকে রাজি হতেই হবে।

অলকা একটু ভয় পায়। ঠিক ভয় নয়, লজ্জাই বোধ হয়। ভয় পাবার মত মন তো তার নয়—আমাকে আবার কি করতে হবে?

—তুমি শঙ্করকে একদিন প্রেম নিবেদন কর। আমি পাশের ঘরে থাকবো। আমি শুধু বোকাটার মুখের ভাবটুকু স্টাডি করবো; দেখি ও কি বলে, আর কি করে!

অলকা বিরক্তির সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়—এসব কি কথা! তোমার বন্ধুকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা রগড় কর, সেটা খারাপ কিছু নয়, কিন্তু আমি ওসব করতে যাব কেন? ছিঃ।

—আরে, শুধু একটু থিয়েটারী ঢঙে অভিনয় করবে।

—কি করতে হবে?

—বলবে, শঙ্করবাবু, আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আজও বুঝতে পারলেন না। আপনি হৃদয়হীন…।

অলকা ঘৃণায় ও লজ্জায় শিউরে ওঠে—রামো রামো! অভিনয় করেও কি এসব কথা বলা যায়! তার চেয়ে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে রাণু যখন এখানে আসবে, তোমরা শালী ভগ্নীপতিতে ষড়যন্ত্র করে শঙ্করকে নিয়ে যত খুশী মস্করা কর, আমি বাধা দেব না। রাণু নাকেমুখে কথা বলতে পারে, এসব ওই ভাল পারবে।

—রাণুকে দিয়ে এসব করালে আমার কি লাভ হলো? আমি যেটা এক্সপেরিমেণ্ট্ করে দেখতে চাই, আসলে সেটাই হবে না।

অলকা বোকার মত তাকিয়ে থাকে। আবার এক কোন্ খেয়াল নিয়ে মশগুল হয়েছে প্রশান্ত? না, প্রশান্তের প্রেমিকতার শ্লাঘা মনের ভেতর থাকলেই সুন্দর ছিল। যেটা নিঃসংশয় সত্য, তাকে বারবার

নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে খুঁটে খুঁটে যাচাই করবার কোন অর্থ হয় না। অবশ্য এসব রগড় মাত্র। সেটা প্রশান্ত জানে, অলকাও বোঝে। তবু··· তবু অলকা একটু বিরক্তই হয়।

অলকা—বড় বেশি ছেলেমানুষী করছো তুমি। লোকটাকে নিয়ে ছিনিমিনি করে কি সুখ পাও বুঝি না।

কিন্তু প্রশান্তের অনুরোধের জেদে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় অলকা—যাই হোক, আমি কিন্তু কথাগুলি বলেই পালিয়ে যাব। কি বলতে হবে লিখে দাও, মুখস্থ করে নিই।

একটা কাগজ টেনে নিয়ে লেখা শেষ করে প্রশান্ত বললো—এই কথা ক'টি বলবে, শঙ্কর, প্রাণেশ আমার। আমার বাইশ বছর বয়সের সকল কামনা শুধু তোমাকেই যে লতার মত জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ওগো চিতচোরা···।

অলকা লেখাটা পড়ে নিয়ে বলে—ভারি রগড় করছো! এসব ভাষা শুনলে কে না বুঝবে যে ভান করা হচ্ছে।

—তা হ'লে কি ভান না ক'রে একেবারে খাঁটি প্রেমের কথা···তা কি ক'রে হয়···তা কি বলতে পারবে?

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে প্রশান্ত। অলকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি যে বল!

প্রশান্ত একটু সমস্যায় পড়ে আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দেয়—যাই হোক্, একটু উদ্‌ভ্রান্তের মত কথাগুলি বলবে, তা হলেই শুনতে বেশ লাগবে। ভান ফান বুঝতে না পেরে ঘাবড়ে যাবে।

বৈঠকখানা সেদিন সন্ধ্যায় এত ভাল করে সাজানো হলো কেন? ফুলদানির ওপর এত বড় ছুটো গন্ধরাজের তোড়া রাখবার কিই-বা প্রয়োজন ছিল? একগুচ্ছ ধূপকাঠি পুড়িয়ে ঘরের বাতাস এত সুরভিত করাই বা কেন? প্রশান্ত অলকার দিকে তাকিয়ে উৎসাহে হাসতে থাকে—বাপ্‌রে, ঘরে যেন সত্যই রোমান্স থম্‌থম্ করছে।

শঙ্করের পায়ের শব্দ শুনে প্রশান্ত পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে গিয়ে বসে থাকে।

বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এসেই শঙ্কর থেমে গিয়ে প্রশ্ন করে—প্রশান্ত নেই ?

অলকা—না, এই কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবে ?

—আজ ফিরতে রাত হবে অনেক।

—আচ্ছা, আমি আজ তা'হলে যাই।

—সে কি কথা ? নতুন করে আপনাকে অনুরোধ করতে হবে নাকি ? চা খেয়ে তারপর যাবেন।

চা আনে অলকা। চা খাওয়া শেষ ক'রে শঙ্কর একটা বই তুলে নিয়ে এক মনে পড়তে থাকে। অলকা উসখুস করে, ঘরের ভেতর পায়চারি করে। চেয়ারের ওপর বসে কিছুক্ষণ, তারপরই ছটফট ক'রে উঠে পড়ে। ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় আলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো থেকে কাগজটা খুলে লেখাগুলি একবার পড়ে নেয় অলকা। সবই মুখস্থ করা ছিল, তবু আর একবার যেন মনস্থ ক'রে নেয়, যেন আবৃত্তি করতে কোন ভুল না হয়, কোন কথা ফস্‌কে না যায়।

ঘরে ঢুকেই অলকা বলল—শঙ্করবাবু।

শঙ্কর—বলুন।

দুটি মিনিট বৃথাই স্তব্ধ হয়ে রইল। অলকা মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

অলকা—শঙ্করবাবু, আপনি রোজই এখানে আসেন কেন ?

শঙ্কর বই পড়া বন্ধ ক'রে বিস্মিত হয়েই অপ্রস্তুতের মত বলে—আমার আসাটা কি আপনারা পছন্দ করেন না ?

—শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন ?

—কাজের দায়েই আসতে হয়। প্রশান্ত দু'একটা পার্টির খোঁজ দেয়, তাই। তা না হ'লে এত ঘন ঘন আপনাদের বিরক্ত করতে…।

—সেই সামান্য খোঁজ নিতে কতক্ষণ সময় লাগে? কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কেন? কি দরকার?

—দরকার কিছুই নয়। আপনারা কিছু মনে করেন না বলেই বসে থাকি।

—তাই ব'লে কি রোজই আসতে হয়? রোজ এখানে আসতে এত ভাল লাগে আপনার?

—তা, ভাল লাগে বৈকি! এত সজ্জন আপনারা।

পাশের ঘরের চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে না পড়লেও, বোঝা যায় সেখানে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ যেন ইঙ্গিতে শব্দ করে বেজে উঠছে। মেঝেতে প্রশান্তের জুতোটা দুবার ঘষা লেগে আর বেশ জোরে একটা শব্দ করেছে। নেপথ্য থেকে যেন কতগুলি সঙ্কেত অলকার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে—অভিনয় ঠিক হচ্ছে না।

অলকা বলে—আপনার বন্ধু সজ্জন হতে পারেন, কিন্তু আমাকে প্রশংসা করছেন কেন? আমি তো আপনার কোন উপকার করি নি!

শঙ্কর—বন্ধু তো সজ্জন হবেনই, তার জন্য তাকে প্রশংসা করার কি আছে? বরং আপনি কেউ না হয়েও যতখানি…।

অলকা—কি?

শঙ্কর—যতখানি খাতির করেন, আপন জনের মত ব্যবহার করেন…।

অলকা—আমি খাতির করি? আমি আপন জনের মত ব্যবহার করি? সত্যি বলছেন?

শঙ্কর আস্তে আস্তে চোখ তুলে অলকার দিকে তাকায়।

তিন চার মিনিট ধরে ঘরের ভেতর একটা মূর্ছাহত নীরবতার মধ্যে দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক করে বাজতে থাকে। কৌতূহলের

আবেগে অস্থির প্রশান্তের চোখ দুটো পর্দার আড়াল থেকে সহসা চোরা টেলিস্কোপের মত উঁকি দেয়।

এক হঠাৎ-গোধূলির ছোঁয়া লেগে বৈঠকখানার ঘরটা যেন অবাস্তব হয়ে আকাশ পটের মত অনেক দূরে সরে গেছে। শঙ্করের মুখটা যেন ছেঁড়া মেঘের মত তার মধ্যে ভাসছে। বসন্তের দাগগুলি তবু স্পষ্ট চিনতে পারা যায়! শঙ্করের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলকা। একটা রাত্রি শেষের চাঁদ যেন একটা জঙ্গলের মাথার উপর সান্ত্বনার জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

শুনতে পায় প্রশান্ত, যদিও অলকার গলার স্বরটা কানে-কানে বলা কথার মতই অস্পষ্ট।—এখানে আসতে ভাল লাগে?

শঙ্করের ছোট ছোট চোখ দুটো আরোও ছোট হয়ে পিলসুজের পোড়া তেলের মত চিক্‌চিক্‌ করতে থাকে।—হ্যাঁ, ভাল লাগে।

অলকা বলে—রোজ আসবেন, কেমন?

শঙ্কর চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে অলকা বুঝতে পারে, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, পুঞ্জ পুঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়া ভেসে আসছে।

একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বই পড়ছিল। অলকা ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকতেই প্রশান্ত হাসে—রগড়টা জমিয়ে তুলেছিলে বেশ।

আবার শান্তভাবে এবং সুস্থির হয়ে একমনে বই পড়তে থাকে প্রশান্ত।

বারবধূ

বাইরের বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায়, তার সঙ্গে একদল মেয়ে ও পুরুষের হাসিখুশী আলাপের কলরব। কারা যেন এসেছে। এইবার কড়া নাড়ছে।

—শুনছেন। বাইরে থেকে এক ভদ্রলোকের গলার স্বর শোনা গেল।

ঘরের ভেতর চমকে উঠলো প্রসাদ। চেয়ারটা ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের অবস্থা যেমন অসম্বৃত, তার বুদ্ধিও তখনকার মত তেমনি অপ্রস্তুত। ফাঁপরে পড়লো প্রসাদ। চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললো—যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই হলো লতা। শিগগির ওঠ।

লতা বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—আমাকে মিছে ভোগাও কেন? আমি ওসবের কি ধার ধারি?

তাকিয়ার ওপর এলিয়ে শুয়ে তেমনি নিবিষ্টমনে সিগারেট খেতে থাকে লতা। পাশে টেবিলের ওপর একটা বীয়ারের বোতল আর চাবি, তখনো ছিপি খোলা হয়নি। একটা রেশমী শাড়ি এলোমেলো-ভাবে লতার কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোতে সবেমাত্র বৈঠক তখন বসেছে।

—অন্যায় করছো লতা। ওঠ লক্ষ্মীটি। তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেল। এতে শুধু আমারই মান বাঁচবে তা নয়, তোমারও। একটা ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে দোষ কি? ওঠ, কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট কর, অনেকক্ষণ ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লতা উঠলো। প্রসাদ তাড়াতাড়ি বীয়ারের বোতলটা আলমারিতে তুলে বন্ধ করলো। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দুটো বড় বড় ছবি নামিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলো। যতদূর সম্ভব ঘরের মূর্তিটাকে দু'চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো প্রসাদ কোথাও কোন অপরুচির ইঙ্গিত সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে যদি বা লুকিয়ে থাকে। হাঁ, ঐ পর্দাটা—জরির কাজ করা এক জোড়া বিলিতী নগ্নিকা বাতাসের দোলায় কুৎসিতভাবে ঢলাঢলি করছিল তখনো। প্রসাদ পর্দাটাকে এক থাবা দিয়ে ধরে, কুঁচকে পাকিয়ে, খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল।

প্রসাদ—এইবার তুমি একটু তাড়াতাড়ি…।

লতা— নাঃ, আর পারি না। তোমার ভদ্দোরপনার ভড়ং রাখতে গিয়ে বার বার বাইরের লোকের কাছে ঢঙ দেখাতে পারবো না। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর-বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকবো কেন? থিয়েটারে খাটলে দুদশ'শো হতো।

প্রসাদ যত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লতার উৎসাহ যেন ততই এক নির্বিকার হৃদয়হীনতায় শ্লথ হয়ে পড়ে থাকে। প্রসাদ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখের চেহারাটা যেন বলছে—জোর করছি না। দয়া করে উদ্ধার কর।

ফিক্ করে হেসে ফেলে লতা। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললে—ডুডু খাবে খোকা? ভদ্দোরলোকের ভয়ে বুক দুরদুর করে, মেয়েমানুষ রাখার শখ কেন? শ্যাম রাখি কুল রাখি—দুই-ই একসঙ্গে হয় না।

লতা একটা তোয়ালে আর শাড়ি আল্না থেকে তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায়। প্রসাদের বুক থেকে বদ্ধ নিঃশ্বাসটা মুক্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দেয়। জন চারেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও যুবক, ছ'সাতটি প্রৌঢ়া ও তরুণী আর গোটা

দশেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

হিলতোলা জুতা আর স্যাণ্ডেলের শব্দ। একপাল ছেলের উল্লম্ফ হুটোপুটি, শাড়ি আর আঁচলের খস্‌খস্ ফিস্‌ফাস্ শব্দ, চুড়ির নিক্কণ, পাউডার ও এসেন্সের একটা সুবাসিত ঝড়, তার সঙ্গে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়দের চুরুটের ধোঁয়া আর হাতছড়ির ঠুক্‌ঠাক—বাইরের পৃথিবী থেকে একটা প্রীতি ও সজ্জনতার উচ্ছ্বাস যেন প্রসাদের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে এসে ছড়িয়ে পড়লো। প্রসাদ হাসিমুখে নমস্কার জানায়—আসুন।

বেশ লোক এঁরা। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই। কেতাদুরস্তী ভদ্রয়ানার বালাই নেই। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। বৃদ্ধ রাখালবাবু গা থেকে আলোয়ানের স্তূপ নামিয়ে প্রসাদের খাটের ওপরেই তাকিয়া টেনে বসে পড়লেন। যে যার ইচ্ছামত চেয়ার টেনে নিল। মেয়েরা ব্র্যাকেট থেকে একটা গোটানো সূতির গালিচা নিজেরাই নামিয়ে নেয়, মেঝের ওপর পাতে এবং বসে পড়ে।

এক যুবক-আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে এক বৃদ্ধ-আগন্তুক বললেন। —এইবার তোমার অভিযোগ শুনিয়ে দাও, রণজিৎ।

রণজিৎ প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে—সত্যি মশাই, আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বলবার আছে। আমরাও আপনার মতই এখানে চেঞ্জে এসেছি। এই তো ক'ঘর মাত্র আমরা, এ ছাড়া আর কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। আমরা খুঁজছি কি'করে দল ভারি করি, আর আপনি বেমালুম আড়ালে লুকিয়ে আছেন ?

প্রসাদ সলজ্জভাবে স্বীকার করে নিল—হাঁ, এটা অন্যায় হয়েছে।

মেয়েদের দল থেকে প্রথম কথা বললো আভা, রণজিতের বোন।

—বড়দা, তোমরা তো এরই মধ্যে নিজেদের দল ভারি করে

ফেললে। আমরা কি করি? ভেতর থেকে তো কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রসাদ তেমনি লজ্জিতভাবে হেসে হেসে বলে।—একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি আসছেন।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো লতা।

চওড়া-পাড় একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে লতা। ঘরে ঢুকে সামনেই বুড়ো রাখালবাবুকে দেখতে পেয়ে লতা থমকে দাঁড়ায়, মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে সামনে নামিয়ে দেয়। লতার সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই, তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।

লতাকে দেখবার পর প্রসাদের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণের ভীরুতা ও কাতরতার খিন্ন ছায়াটুকু সরে গেল। কথাবার্তায় সহজ স্ফূর্তি ফিরে পেল প্রসাদ।

রণজিতের বোন আভা লতাকে হাত ধরে গালিচার ওপর বসাবার জন্য একবার টানলো। লতা বললো – ভেতরে চলুন।

বাইরের ঘরে ও ভেতরের ঘরে অবাধ গল্প তর্ক ও হাসির পালা গড়িয়ে চললো অনেকক্ষণ। ছেলেপিলেরা দু'বার মারামারি বাধালো। তাদের থামাতে গিয়ে বুড়োরা গোলমাল করলো আরও বেশি। আজ দেড় মাসের মধ্যে বরাকর কলোনির একান্তে এই নিরালা বাংলো বাড়িটার কোন সন্ধ্যা আজকের মত এত হর্ষমুখর হয়ে ওঠে নি।

অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করার জন্য লতা খাবার তৈরী করবার উদ্যোগ করে। মেয়েরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করে—শুধু চা হলেই হবে, খাবার টাবার করবেন না, খবরদার।

লতা বলে—কিন্তু ছেলেরা কি খাবে? শুধু চা? তা হতে পারে না।

লতা রাগ করেই বলে—দেখছেন তো, ওদিকে মশাই কেমন

নিশ্চিন্ত মনে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছেন। এদিকের কাজের জন্য কোন হুঁশ নেই, একটু খোঁজখবরও নেই।

মেয়েরা হেসে উঠলো সবাই—তা বেশ করেছেন, আপনি হিংসে করছেন কেন?

আভা হঠাৎ নিজের খেয়ালেই বাইরের ঘরে এসে বলে—বৌদি রাগ করেছেন। ভেতরে কত কাজ রয়েছে, আর আপনি সব ভুলে এখানে গল্পে ডুবে আছেন?

প্রসাদ—কেন কি ব্যাপার?

আভা—স্বয়ং এসে খোঁজ নিন।

লতাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। দরজার আড়ালে ভেতরের দাওয়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রসাদ ভেতরে আসতেই ফিস্ ফিস্ করে লতা বলে—চা না হয় হলো, কিন্তু ছেলেপিলেদের কি দেব? তুমি একবার বাজারে ঘুরে এস, কিছু মিষ্টি টিষ্টি……।

আভা এবং আরও দু'টি তরুণী ঐ মৃদু ফিস্‌ফিসের ভাবার্থ বুঝতে পেরেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করে—বৌদি বড় বাড়াবাড়ি করছেন!

প্রসাদ বলে—বিস্কুটের টিনটা খুললে হয় না? নইলে বাজারে অবশ্য যেতে হয়।

লতা বলে—তাইতো, মনে ছিল না। যাক্, ওতেই হবে।

বিস্কুটের টিন শূন্য করে দিল ছেলের দল। মেলামেশার পালা ক্ষান্ত হলো রাত্রি দশটায়। তার আগে প্রসাদকে গাইতে হলো গান; ঘরের কোনে শালুর খোলে ঢাকা এসরাজটা গুণী প্রসাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিল।

রাখালবাবু আলোয়ানটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন আবার। রাখালবাবুর স্ত্রী, মেয়েরা এঁকে মাসীমা বলে ডাকছিল, পায়ের মোজাটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। তাঁর ফোলা ফোলা পা দুটোতে বেরিবেরির নিদর্শন স্পষ্ট। তারকবাবু নতুন চুরুট ধরিয়ে হাতছড়িটা

আবার ঢুকলেন। আভা ছাড়া সঙ্গের আর তিনটি মেয়েই হলো তাঁর ভাগ্নী, ভাইঝি আর শ্যালিকা। ছেলেপিলেদের মধ্যে চারজন হলো রাখালবাবুর নাতি, বাকী সবকটি হরিশবাবুর। হরিশ দম্পতি আজ অনুপস্থিত। তাঁরা বাতের প্রকোপে এখন শয্যা আশ্রয় করে আছেন।

রাখালবাবু বললেন।—তা হ'লে এইবার তোমায় মুক্তি দেব প্রসাদবাবু। রাত হলো অনেক। আমরা উঠি।

বিদায় প্রসঙ্গে আর একবার আলাপবার্তার কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। প্রসাদ ফটক পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল। লতা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল ছায়ার মত।

চলে গেল আগন্তুকের দল।

—আঃ বাঁচা গেল! বীয়ারের বোতলটা আবার টেবিলের ওপর নামালো প্রসাদ। শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লতার, তাই বিছানার ওপর একটা বালিশ আঁকড়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু প্রসাদের গলার স্বরে স্ফূর্তি চড়ে উঠেছে—এ কি? উঠে বসো লতা। এ সময়ে বে-রসিকতা করো না মাইরি!

লতা কোন সাড়া না দিয়ে তেমনি নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকে। প্রসাদ হাত ধরে টানাটানি করতেই উঠে বসে এবং রুক্ষস্বরে বলে—যখন তখন অসভ্যতা করো না।

প্রসাদ—বেশ বেশ, করবো না। যাও, এবার চট্‌পট্ এই আল্‌তা ফাল্‌তা সাজসজ্জা বদলে এস। এক পাত্র চড়িয়ে নিয়ে বসা যাক্ জুত করে।

লতা—এ রকম ক্যাংলাপনা করছো কেন? কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে চলে গেল লতা। তাঁতের শাড়ি ছাড়লো, আলতা সিঁদুর মুছে ফেললো। আকস্মিক একটি সন্ধ্যার কপট বধূবৃত্তির

নির্মোক ঘুচিয়ে, পায়জামা পরে চটি পায়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকলো।

প্রসাদ খুশীতে আটখানা হয়ে গেল—বাঃ, সত্যিই তোমাকে ফাইন মানিয়েছে এইবার।

লতার কানে যেন কথাটা গেল না; ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লতা। দূরে বরাকরের পুলের ওপরে একটা আলোর সারি মিট মিট করছে। আর কিছুই দেখা যায় না। নিকটেই একটা নামহীন ফুলের গাছের তলা থেকে স্তূপীকৃত বাসি ফুলের পচাটে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। লতা লম্বা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরে নেয়, আস্তে আস্তে ছাড়ে।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদের যেন চমক্ ভাঙলো। দ্বিতীয় বীয়ারের বোতলটা শেষ হয়েছে। লতা তখনো জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়। তার পর বিড়বিড় ক'রে বলে, স্বর জড়িয়ে যায়—বেশ, বেশ! ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক। দূরের বন্ধু দূরেতে রহ। কিন্তু তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়। এতগুলি ভদ্র নরনারীকে দিনে তারা দেখিয়ে দিলে বাবা। তবু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিশ দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু......কিন্তু তুমি আমাকে এই মাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোমাকে জুতিয়ে... ।

টেবিলটা একটা ঠেলা মেরে উল্টে দিয়ে সরোষে দাঁত ঘসে প্রসাদ একটা হুমকি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লতা শান্ত ও সহজ অথচ দৃঢ় স্বরে বলে—হঠাৎ এত মেজাজ জেগে উঠলো কেন? বসো বলছি।

প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মত তবু যেন থেকে

থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভাল করেই এ-রোগের ওষুধ জানে। এখনি প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে যদি একটু ফষ্টি করা যায়, অথবা দুটো খেউড় গেয়ে ওঠে, তবে ঐ মেজাজের আগুন ঠাণ্ডা ছাই হয়ে উড়তে কতক্ষণ।

প্রসাদ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ ক'রে, একটা দৃপ্ত ভঙ্গি নিয়ে বলে—যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে!

লতা—বলেছি তো, তাই থাকবো।

প্রসাদ—তবে এত পোজ করছো কেন? তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র।

লতা—তা তো জানিই।

প্রসাদ—তুমি আভার চাকরানি হবার যোগ্য নও।

হঠাৎ যেন আগুনের ঝাপটা লেগে লতা ছটফট করে উঠলো। এতক্ষণ প্রসাদের বকাবকিকে নেশাড়ে মানুষের মূঢ়তা মনে করেই চুপ করে ছিল লতা। কিন্তু এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে যেন একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

প্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে তার মুখের ওপর কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল লতা। কিন্তু লতার ক্ষোভ শুধু ফণা তুলে দাঁড়ালো মাত্র। ছোবল আর পড়লো না।

—তোমার কাছে বাঁধা থাকতে কোন গরজ নেই আমার। আমি কালই চলে যাব তারকেশ্বরে। লতা সরে এসে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে দরজার খিল এঁটে দিল।

অনেক রাত্রে একটানা স্তব্ধতার পর লতার ঘরের কড়া বেজে উঠলো আবার। নেশা কেটে যাবার পর প্রসাদের মনের অবসাদের মধ্যে সেই ভালমানুষী ভীরুতা যেন আবার সতর্ক হয়ে উঠেছে। লতাকে সে ভাল করেই চেনে। এসব মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। জীবনের চোরাঘরে ওরা পাপের সঙ্গে চুক্তি ক'রে চলে। বাইরের আঙিনা, যেখানে

আত্মীয়তার মেলা, সেটা ওদের কাছে বিদেশের মত দুর্বোধ্য। তার মর্যাদা দেবার মত কোন দরদ ওদের নেই। লোকসমাজে প্রসাদের মান মর্যাদার জন্য কতটুকু মাথাব্যথা লতার? কাল সকালেই যাবার আগে হয়তো বরাকর কলোনির প্রতিটি প্রাণীকে জানিয়ে দিয়ে যাবে নিজের পরিচয়, আর সেই সঙ্গে প্রসাদের এত যত্নে গড়া সুনামের সামাজিক স্বাক্ষরে কালি ঢেলে দিয়ে যাবে।

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বলে—লতা, বল তুমি রাগ কর নি, তবে আমি ঘুমোতে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বল, তা না হলে এখান থেকে নড়বো না।

প্রসাদ বারবার কড়া নাড়তে থাকে, ঘরের ভেতর থেকে লতার শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাব আসে—না, আমি যাব না। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

—চাচিজী!

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লতাকে ডাকছে বিক্রম, সুবেদার-বাবুর ছোট ছেলেটা। মেজের ওপর বিক্রমের লাট্টু মাঝে মাঝে খর্ খর্ করে চক্কর দিচ্ছে শোনা যায়। ঘুম ভাঙতেই প্রসাদ বুঝলো ভোর হয়ে গেছে।

কদিন থেকে রোজ প্রত্যূষে ছেলেটা আসে। লতার সঙ্গে চা পাউরুটি খায়। তারপর কিছুক্ষণ পেঁপে গাছটার নীচে মাটী দিয়ে একটা কেল্লা তৈরী করে, পেঁপে ডাঁটার তোপ দিয়েই শেষে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

ভাঙা স্বপ্নের মত গত রাত্রির ঘটনার ছবিগুলি যেন জাগ্রত চেতনায় আবার জোড়া লেগে সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রসাদের কাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রসাদ বুঝতে পেরেছে—পাশের ঘরে

লতা জেগে উঠেছে, কাপড়চোপড় ছাড়ছে। এইবার বাইরের ঘরের খিল খুলছে লতা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যায়, লতা বলছে—এস বিক্রম।

বিক্রম যেন অনুযোগ করে বলে—কিত্‌না নিঁদ যাতি হো চাচিজী!

প্রসাদ শুয়ে শুয়ে সবই অনুমান করে নিতে পারছিল। মহাবীর চাকরটাও বোধ হয় এসে গেছে। ঝাড়ু দেবার শব্দ শোনা যায়। তার পর? তার পর মহাবীর চা নিয়ে আসবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তার পর আরও দেখতে হবে—লতা সুগৃহিণীর মত সারা দুপুর মহাবীরের কাজ তাদারক করছে। ভাঁড়ার খুলে হিসেব করে ঘি-ময়দা বের করছে। তার পর খাওয়া। লতা তখন স্নান সেরে মহাবীরের সঙ্গে ধর্মশালার মন্দিরে প্রসাদ আনতে যাবে। এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে সমস্ত দিন ধরে এই নিষ্ঠাশীল ও নিয়মিত কর্তব্যের সাধনা। প্রেরণা নেই, তবু যেন নিজের দমেই চলে। প্রসাদের মনও যেন ক্লিষ্ট যাত্রীর মত এই খাপছাড়া মুহূর্তগুলির চাকার ওপর দিয়ে ধৈর্য ধরে গড়িয়ে চলে যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়, গন্তব্যে এসে পৌঁছে। তখনি শুধু লতাকে কাছে পাওয়া যায় আর চিনতে পারা যায়। তার আগে, এতক্ষণ সে বাংলো বাড়ির হাওয়া থেকে যেন উবে যায়।

বিক্রম চলে যায়, এবং যেতে না যেতে হয়তো লালাবাবুর স্ত্রী এসে বিশ্বসংসারের কাহিনী নিয়ে বসেন। লালাবাবুর জামাইটির চাকরি নেই, মেয়েটা দুঃখে আছে। কাহিনী শুনে লতার মুখ ম্লান হয়ে যায়। দেখে মনে হয়, দুঃখটা যেন লতার মনে বড় বেশি বেজেছে।

সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রসাদের কাছে আজ কেমন যেন গর্হিত মনে হয়। এত বড় একটা ফাঁকি সত্যের সাজ সেজে থাকবে, আলো-অন্ধকারের তফাতটুকুও যে মিথ্যে হয়ে যায়।

রাখালবাবুর বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল—প্রসাদবাবু, লতাকে

আজ বিকেলে একবার পাঠিয়ে দিও। আজ রাত্রে এখানেই ছুটো ডাল ভাত খেয়ে ফিরবে। ইতি—মেসোমশাই।

চিঠি পড়ে অপ্রসন্ন হয় প্রসাদ। ছুশ্চিন্তার জাল আরও জটিল হয়ে ওঠে। কেমন যেন ভয় ভয়ও করে। এবং কি করবে ভেবে পায় না। ঘরের পর্দা সরিয়ে দিয়ে দেখ্‌তে পায়, বারান্দায় বসে মশলা বাছ্‌ছে লতা।

আজকের সকালে লতার মনটাও কেমন অস্বস্তিতে ভরে আছে। মাঝে মাঝে অকারণে ভয়ও করছে। কিসের জন্য এবং কেন, লতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এ রকম কোন দিন হয় নি। নইলে তাকে গালাগালি দিয়ে সেরে যাবে, এমন কোন জমিদারের বেটা আজও সে দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের দিকেই চেয়ে লতা আশ্চর্য হয়, কালকের রাত্রির ঘটনা নিয়ে একটা ঝগড়া বিতণ্ডা করার মত উৎসাহও যেন সেখানে আর নেই।

লতার বুঝতে দেরী হয় না—এটা ভয় নয়, ছুর্বলতা। কিন্তু ছুর্বলতাই বা কেন?

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যেই লতার মন ধীরে ধীরে আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। তাড়িয়ে দেবে? দিক্ না, তাতে ক্ষতি কি? সেই মাড়োয়ারী বেনিয়াটা এখনও আছে, তু করে ডাকলেই চলে আসবে। কিন্তু যাবার আগে এই ভালমানুষের ছেলেকে এমন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, জীবনে যেন আর বেশ্যার সঙ্গে বেয়াদবি করার ছুঃসাহস না হয়।

—লতা।

প্রসাদের ডাক শুনে লতার বুকটা তবু আশঙ্কায় ছমছম করে

উঠলো। প্রসাদ এগিয়ে আসতেই লতা মাথা নীচু করে মসলা বেটে চললো, কোন উত্তর দিল না।

—রাখালবাবুর বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। যাবে?

চোখ তুলে তাকালো লতা। আশঙ্কার ঝাপসা পর্দাটা সরে গেল। উত্তর দেয়—যাব।

—যাও, কিন্তু কোন রকম বেয়াড়াপনা যেন টের না পায়।

নাটকের সীন পাল্টে গেছে। নতুন দৃশ্যের আরম্ভ। যেমন অদ্ভুত তেমনি জটিল। শুধু লতা নয়, প্রসাদও তার সংগুপ্ত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহুমানুষের মেলামেশার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসাদের সন্ধ্যেগুলি বেশির ভাগ আভাদের বাড়িতেই কেটে যায়। লতা যায় রাখালবাবু, তারকবাবু ও হরিশবাবুর বাড়ি। তা'ছাড়া সুবেদার ও লালাজীর বাড়িও আছে। শুধু আজ পর্যন্ত আভাদের বাড়ি লতার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার দু'বার নেমন্তন্ন এসেছে। কিন্তু দুদিনই হঠাৎ কেন জানি লতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একদিন জ্বর আর একদিন মাথাধরা।

প্রসাদ খুশী হয়ে বলে—সত্যিই তোমার বাহাদুরি বলতে হবে। যেখানে যাই, সবারই মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরে না। কি চালই চেলেছ লতা!

উত্তরে লতা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—দেখো, বেশি বাড়িয়ে তুলো না যেন।

লতা—বাড়িয়ে তুললে তোমারই মান বাড়বে।

প্রসাদ হেসে ফেলে—সত্যিই কি যে কাণ্ড হচ্ছে! এক এক সময় যা ভয় করে আমার! যদি একবার ধরা পড়ে যাও লতা, কি ব্যাপার হবে বল তো?

লতা—আমার আর কি ছাই হবে? বনের পাখি বনে ফিরে যাব।

প্রসাদ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কি যেন ভাবে, তারপর অন্যমনস্কের মতই বলতে বলতে চলে যায়—হাঁ, তোমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু…।

আভা আরও দু'তিন দিন প্রসাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আভা কথা বলেছে লতার সঙ্গে, কিন্তু প্রথম দিনের সেই সহজ স্বচ্ছতা তার মধ্যে আর ছিল না। পরিচয় যত পুরনো হয়েছে, ব্যবধান বেড়ে গেছে তত। লতাও ঠিক সহজ ভাবে মিশতে পারেনি। কথা বলেছে লতাও, কিন্তু তাল কেটে গেছে বার বার। লতা চা এনে আভার সামনে ধরেছে, আভা আপত্তি করেছে, কিন্তু সাধাসাধি করতে পারে নি লতা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

প্রসাদ আর লতা। যখন এরা দুজন শুধু থাকে, তখনই এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কথাবার্তা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে এসেছে। লতা বেড়িয়ে এসে দেখে প্রসাদ তখনও ফেরেনি। প্রসাদ বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখে—লতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ভদ্রলোকদের বাড়িতে মেয়েদের গল্পের আসরে লতার প্রসঙ্গ এক-একবার ওঠে। মাসীমা বলেন—মেয়েটা বড় শান্ত।

তারকবাবুর মেয়েরা, নিভা প্রভা ও মমতা একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে—লতাবৌদি বেচারা সত্যি ভালমানুষ। আভা মিছিমিছি ওর নিন্দে করে।

মাসীমা গলার স্বর চড়িয়ে প্রশ্ন করেন—আভা কি বলেছে?

মমতা—লতাবৌদি নাকি লেখাপড়া জানে না। একেবারে গেঁয়ো, গাঁয়ের মেয়ে।

মাসীমা চটে উঠলেন—আভা নিজেকে কি মনে করে? ভয়ঙ্কর

বিদুষী? মর ছুঁড়ি, বিয়ের ছ'মাস না যেতে স্বামী হারিয়েছিস, বিদ্যে নিয়ে ধেই ধেই করছিস। লজ্জাও করে না।

নিভা প্রভা হেসে ওঠে। আভার ওপর মাসীমার আক্রমণের একটা অর্থ হতে পারে, মাসীমাও গাঁয়ের মেয়ে।

লালাজীর স্ত্রী এসেছেন। লতা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে। বাইরের ঘরে গল্প করে প্রসাদ, আভার সঙ্গে।

প্রসাদ বেশ জোরে জোরে যেসব কথা বলে, শুনে আভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘন ঘন দরজার দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার সুরে বলে—আপনার কোন ভয়ডর নেই, প্রসাদবাবু!

একটু পরেই দেখা যায়, আভা ও প্রসাদ বেড়াতে বার হয়ে যাচ্ছে। লালাজীর স্ত্রী বোকার মত লতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—ও ছোক্‌রি কে লতা? ওর চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি একটু কড়া হও, লতা?

লতা বলে—আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে, আমার স্বামীও ঠিক থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

লালাজীর স্ত্রী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন।—তা বটে।

কিন্তু লতার নিজের কথার প্রতিধ্বনি তার অন্তরের ভেতরে প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত বেজে ওঠে। হেসে ফেলে লতা।

প্রভার স্বামী এসেছে, প্রভাকে নিয়ে যেতে। তারক বাবুর বাড়ি তাই আজ লতা ও প্রসাদের নেমন্তন্ন ছিল। সব মেয়েদের মত লতাও জামাইয়ের সঙ্গে গান গল্প ও ঠাট্টা নিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসলো। বিদায় নেবার সময় প্রসাদ দেখতে পায়, প্রভার স্বামী লতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। প্রসাদের সারা মনটা একটা অপঘাতে যেন ছিঁড়ে পড়লো।

পথে আসতে লতাকে গম্ভীরভাবে প্রসাদ বলে—সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

লতা উত্তর দেয় না।

প্রসাদ বলে—এই পাপ আমার লাগছে। তোমার কিছু হবে না।

প্রসাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে খুশী হতে পারতো লতা। সব পাপ প্রসাদের জীবনের অভিশাপ বড় করে তুলুক্, লতা তাহ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছিল না লতার। তাই লতার বুকের ভেতরটাও শিউরে উঠেছিল সংশয়ে।

প্রসাদের অনুমান সত্য হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরীহ নির্দোষ মানুষের হৃদয়ের প্রীতিকে এত বড় ফাঁকি দেওয়া পাপ বৈকি। সে পাপের ভাগী কি সে নিজেও নয়? কিন্তু কোন্ স্বার্থের খাতিরে? প্রসাদের মানের জন্য?

লতা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েও হেসে ওঠে। আরও বেশি করে হাসি পায়, প্রসাদের ভাগ্যবিপাক দেখে।

ঘরে ফিরে প্রসাদ আবার কথা পাড়লো। কথার খাপছাড়া ভঙ্গিতে বোঝা যায়, অনেক কিছু সে বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না, সে সাহস তার নেই।

প্রসাদ বলে—আজকাল দেখছি ঘরের ভেতরেও তুমি বড় শুদ্ধাচার চালিয়েছ। এখানে তো তোমাকে কেউ দেখতে আসে না। তবে এখানেও ক'নে বউটি সেজে থাক কেন?

লতা—কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

প্রসাদ—আমি না ডাকলে তোমার তাতে কি আসে যায়? দরকার থাকলেই ডাকবো। কিন্তু তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে কেন? তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। তোমার এত কষ্ট করার দরকার নেই।

লতা—তোমাকেও কোন উপদেশ দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনি থাকবো।

লতার এই উদ্ধত উক্তি প্রসাদকে অপমান করলো ঠিকই, কিন্তু তার বিভ্রান্ত ও অসহায় চিত্তের অলিগলি ঢুঁড়ে সে এমন কোন যুক্তি

আশ্রয় পেল না, যেখানে এসে লতাকে উপেক্ষা করা যায়। তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটা যেন লতা হাত করে ফেলেছে।

লতা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছে। আভার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলে। তার একটা মেকি আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয়, হোক্, তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবী সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব বাধা ছাপিয়ে গেছে।

এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক্ না। বাহির যার এত বিচিত্র, অন্তর শূন্য থাকলে ক্ষতি কি? লতার দিনগুলি এই আশ্বাসে ভরে উঠছিল। চোরাবালির ওপর কত বড় দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও লতার সংসার তার প্রমাণ।

আভার জ্বরের খবর শুনে প্রসাদ সেই যে সকালবেলা বের হয়েছিল, ফিরে এল এই সন্ধ্যায়। আভার জ্বরের সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার মত আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে, শুধু অকারণ কান্না। রণজিৎ বলেছে, আভার জ্বর আগেও হয়েছে, কিন্তু এসব উপসর্গ কখনও ছিল না।

লতাও সবেমাত্র বেড়িয়ে ফিরেছে।

প্রসাদ ঘরের ভেতর চিন্তিতভাবে পাইচারি করে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একটা কৌতুক যেন বিভীষিকা হয়ে চারিদিক থেকে তাকে চেপে ধরেছে।

অনেকদিন পর প্রসাদ আজ আবার কথা বললো—তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছো, লতা। আভার নামে নিন্দে রটাবার সাহস পেলে কোথায়?

লতা—নিন্দে? আমি আভার নামে কোথাও তো কিছু বলি নি।

প্রসাদ—সেটাও একরকমের নিন্দে ও অপমান করাই হলো।

প্রসাদের কথাগুলির মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। মেজাজও আগের মত দপ করে জ্বলে ওঠে না। বিচারকের রায়ের মত অবিচল সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ণ ও শান্ত।

লতা—বল, কি করবো ?

প্রসাদ—না তোমাকে দিয়ে আর বেশি নাটুকে খেলা করতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভাল ভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ, চিরকালই তো এমনি ভাবে চলতে পারে না, তাতে তোমারই বা লাভ কি ?

চুপ করে শুনতে থাকে লতা।

প্রসাদ যেন আরও একটু শক্ত হয়ে উঠ্‌লো—তারপর, আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তুমি কি বস্তু ? তাহলে আমি কোথায় থাকি ? তুমি আমার মানমর্যাদার চাবিকাঠি আগলে বসে থাকবে, তা হয় না। তোমাকে ভয় করে চলতে হবে, তোমার মেজাজ মরজির জন্য সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, এ হয় না।

লতা টেবিল ল্যাম্পটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। কথা বলতে সেও জানে, কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন করার মত যুক্তি তার নেই, তার সে শিক্ষাদীক্ষা নেই। সে প্রয়োজনও কখনও হয় নি।

প্রসাদ বলে—তোমার চলে যাওয়া উচিত।

লতার শরীর পাথরের মত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল।

—তোমার যা পাওনা হয়েছে, সব মিটিয়ে দিচ্ছি, আরও কিছু দেব।

লতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু, তারপর আমার চলবে কি করে ?

প্রসাদ এইবার মেজাজ হারালো—সেটা কি আমার ভাবনা ? ভুলে গিয়েছ, এখানে এসে প্রথম দিন তোমায় রাঁধতে হয়েছিল বলে কি কাণ্ড করেছিলে ? বাক্সপেঁটরা নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে। কত সাধতে হয়েছিল মনে আছে ? তোমার মত একটা···।

প্রসাদের কথার মধ্যে এক তিল মিথ্যা নেই। প্রতিবাদের কোন অবকাশ নেই। নিছক নিরেট সব সত্য কথা। কাহিনী নয়, ঘটনায় গড়া ইতিহাস।

প্রসাদ তখুনি আবার শান্ত হয়—তুমি যেজন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচি আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছ।

প্রসাদের গলার স্বর আরও নরম হয়ে এল—সত্যিই, আমি এভাবে টিঁকতে পারছি না, লতা। তোমার বোঝা উচিত।

এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মত, নিঃসহায়ের আবেদনের মত শোনায় কথাগুলি।

লতা বলে—সত্যি বলছো, আমায় যেতে হবে?

প্রসাদ—হ্যাঁ। শুধু ভাবছি, কার সঙ্গে যাবে।

লতা উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে—তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি একাই যাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিও কিছু, মামা-কাকা কেউ এসে নিয়ে গেছে। কাল ভোরেই যাচ্ছি।

প্রসাদের সম্মুখ থেকে লতা সবেগে ছুটে অন্য ঘরে চলে যায়।

মাত্র আজ রাত্রিটা। জেগে থাকলেও কেটে যাবে, ঘুমিয়ে পড়লেও কাটবে। তবু খুব ভোরেই উঠতে হবে, বিক্রম আসবার আগেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে যেতে হবে।

ভেতরের বারান্দার অন্ধকারে মেজের ওপর নিঝুম হয়ে বসেছিল লতা। উঠোনে তখনো থালায় সাজানো ডালের বড়িগুলি হিমে ভিজ্‌ছে। আচারের বয়ম দুটো রয়েছে। এখনো উঠিয়ে রাখা হয়নি। আর প্রয়োজন নেই।

লতা একবার নিজের মনে হেসে ফেলে। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে।

যদি কেউ টের পেয়ে যায়, এই ভয়। আজ যদি মাসীমা বুঝতে পারেন, তারকবাবু হরিশবাবু শুনতে পান যে, আমি লতা নই, আমি তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি? আমিই যদি ফাঁস করে দিই? তা'হলে ভদ্রলোকের জমকালো সম্মান কোথায় থাকে?

কিন্তু সে যে অসম্ভব! ওভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে লতার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল।

আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু, মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মত শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক্। মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসীমার বেরিবেরি সেরে যাক্।

বুঝতে পারে, এবং স্পষ্ট ভাবেই কল্পনা ক'রে নিতে পারে লতা, ভদ্রলোকের ছেলে প্রসাদের ভদ্রপ্রেমের আবেগ কোন্ পথে মুক্তি খুঁজছে। এক বছর দু'বছর পরে এ বাড়ির ভবিষ্যতে এই রকমই একটি রাত্রি লুকানো আছে। তখন লোকে শুধু জানবে, লতা মরে গেছে। বিধবা আভার মাথায় নতুন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে, এই বাড়ির ঘরে ঘরে আভার সংসারপনার চুড়ি শাঁখা বাজবে ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ ক'রে।

উনি কি করছেন? ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। বোধ হয় বই পড়ছেন।

বোধ হয় মতিগতি ফিরে গেছে। কিন্তু একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে, বেণী দুলিয়ে, চোখে সুর্মা লেপে, এক পাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের উপর গিয়ে চড়ে বসি, চরিত্তিরওয়ালার মুরোদটা দেখি একবার। কিন্তু ছিঃ!

তা করতে পারলেও যে ভাল ছিল। কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না, কারণ লোকটাকে কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে

আজ। জীবনে কোন লুচ্ছাকে ছোঁবার আগে এত ঘৃণা হয়নি কখনো। তবে, কড়া এক পেয়ালা মদ গিলে নিলে বোধ হয় এ ঘেন্না ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু মদ? গেরস্থের বাড়িতে মদ? মনে হতেই লতার বুকটা দুরদুর্ করে ওঠে।

সব সামর্থ্য যেন খসে পড়ে গেছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে লতা, শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে। ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই ছদ্ম মূর্তিটার ওপর বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে। ভাঙতে পারে না এই মূর্তিকে, ভাঙবার চেষ্টাও করতে পারে না, বোধ হয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না। কোন উপায় নেই।

চোখ দুটো একবার আঁচল দিয়ে মুছে নিল লতা। যাত্রাগানের পালায় রাণীগুলো বনবাসে যাবার আগে বোধহয় এই রকম কাঁদে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে। কিন্তু ঐ লোকটার ওপর যে প্রতিশোধ না নিয়ে যাওয়া যায় না। নিস্তব্ধ রাত্রির শূন্যতার মধ্যে একটি প্রতিশোধের মুহূর্তকে শুধু মনে মনে জপতে থাকে লতা।

না; উঁচুদরের প্রেমের ঐ অহংকারের ওপর পক্ষীবিবির ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিয়ে। ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ রায় শুধু অপমানের যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে; লোকের কানের ভয়ে জোর গলা ক'রে একটা কথাও বলতে পারবে না। বেশ হবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা!

ঘরের ভেতর হঠাৎ পড়া বন্ধ করে প্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোন না কোন দিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন হঠাৎ এই ধরনের একটা শঙ্কায় ভরে

উঠলো। রাগানো উচিত নয়, বেশ খুশী করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত।

একতাড়া নোট দেরাজ থেকে বের করে প্রসাদ লতার কাছে একটা আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

—এই নাও। আমার ওপর মনে কোন রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি।

লতা হাত পেতে নোটগুলি নেয়। চুপ ক'রে বসে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—কি চুপ করে রইলে যে?

মুখ তুলে তাকায় লতা। প্রসাদের হাতের লণ্ঠনের আলো লতার চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রখর হয়ে জ্বলছে লতার চোখের তারা; যেন বিবরের অন্ধকার থেকে ফণা তুলে এক বিষধরী তার জীবনশত্রু একটা জীবের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভয় পেয়ে কম্পিতস্বরে প্রসাদ ডাকে—লতা!

বোধ হয় আলোর ধাঁধাঁনি থেকে দৃষ্টি আড়াল করার জন্যই হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিল লতা। আর, কী আশ্চর্য, সত্যিই যেন এক লাঞ্ছিতা গৃহবধূ; ভীরু অভিমানের একটি করুণ মূর্তি; আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে লতা বলে—না, তুমি ক্ষতি করনি; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো।

অলীক

তারিণী মিত্তির রোডে সবচেয়ে বড় লাল-রঙের বাড়িটার ফটকের মাথায় শালুর কাপড় দিয়ে মোড়া আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো একটা মাচানের ওপর শানাই বাজছে সন্ধ্যেবেলা। আজ গগনবাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে।

আঙ্গিনার ওপর ফরাস পাতা হয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে এসে বস্‌ছেন। তেতলার ছাতে গোলপাতার ছাউনির নীচে বিদ্যুতের বাত্তি জ্বলে, এবং ছাদের দিক থেকে জনতার কলরবও শোনা যায়। বুঝতে কষ্ট হয় না, একদল লোক এরই মধ্যে খেতে বসে গেছে।

ফরাস-পাতা আসর ছাড়া আর একটা আসরও করা হয়েছে, আর একটু ভিতরের দিকে, হলঘরের প্রায় কাছাকাছি একটা রোয়াকের মত জায়গার ওপরে। প্রায় শ'খানেক চেয়ার পাতা এই আসরের এখানে ওখানে গোটা কয়েক তে-পায়া ছোট ছোট টেবিল আছে এবং তার ওপর আছে ছোট ছোট রূপোর রেকাবিতে পান আর একটা ক'রে সিগারেটের টিন। এখানে বসেছেন বরযাত্রীর দল, এখানেই এসে বসবেন বিশিষ্ট গণ্যমান্যের দল। গগনবাবুর কারবারের যিনি মুরুব্বী এবং মহাজন সেই দত্তবাবুও এসে বসলেন। স্টুয়ার্ট এণ্ড মিলারের পারচেজিং-এর অধ্যক্ষ বিরাটকায় দত্তবাবু, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ফ্লানেলের একটা আলখাল্লা গোছের জামা গায়ে।

আঙ্গিনার ফরাস-পাতা আসর এবং এই রোয়াকের ওপর চেয়ার-পাতা আসর, মাঝখানে যে ব্যবধান রয়েছে, তাকে জুড়ে রেখেছে যোজকের মত একটা সরু পথ। এখানে দাঁড়িয়েছিলেন গগনবাবুর মেয়ের বড় পিসেমশাই আর ন'মামা। তা'ছাড়া চারিদিকে ঘুরে নজর

রাখ্‌ছিল একটা ভলান্টিয়ার দল। যে-সে দল নয়, বাছাই করা স্যাণ্ডো মার্কা ছেলের দল—হাবুল, আলোক, অশেষ আর বঙ্কু। নেপালের চেহারাটা সত্যিই স্যাণ্ডো গোছের, হাত দুটো বেশ মাস্ক্যুলার, ভারি ভারি দুটো লোহার হাতুড়ির মত দেখতে। হাবুল, আলোক, অশেষ আর বঙ্কু চেহারার দিক দিয়ে যাই হোক না কেন, ওরাও স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়েছিল।

নিমন্ত্রিতদের ভিড় বাড়তে থাকে, বড় পিসেমশাই এবং ন'মামা একটু বেশি ক'রে সাবধান হতে থাকেন। স্যাণ্ডোর দলও বিয়ে বাড়ির নানাদিকে ঘুরে ফিরে কড়া নজর রাখতে থাকে।

তারিণী মিত্তির রোডে সবচেয়ে বড় লালরঙের বাড়িতে আজ পৃথিবীর মানব জাতিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ ক'রে ফেলা হয়েছে। প্রথম হলো, যাঁরা ফরাস-পাতা আসরে বস্‌বেন এবং তেতলার ছাদে বসে খাবেন। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক বাছাই-করা যাঁরা চেয়ার-পাতা আসরে বসবেন এবং হলঘরের ভেতরে বসে খাবেন। তৃতীয়, যাঁরা এই দুই আসরের কোন আসরেরই নয় অর্থাৎ নিমন্ত্রিতই নয়, যাদের খাওয়াবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, এবং ধরতে পারলে যাদের সোজা টেনে নিয়ে ঘা'কতক ভাল শিক্ষা দিয়ে একেবারে ফটক পার করে দিতে হবে।

তেতলার ছাদে যাঁরা খাবেন, তাঁদের জন্য লুচি, বেগুন ভাজা, মাছের ঘণ্ট, দই আর দরবেশ—এই ছয়টি ভোজ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হলঘরে যাঁরা খাবেন, তাঁদের জন্য ঐ ছয়টি ভোজ্য ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ ভোজ্য আছে—আনারসের চাট্‌নি, সন্দেশ, পায়েস, মাছের কালিয়া এবং রাব্‌ড়িও।

কাজেই সাবধান হতে হয়েছে। কোন বিশিষ্ট সজ্জন যদি ভুলক্রমে ফরাস-পাতা আসরে বসেন এবং তেতলার ছাদে বসে সাধারণ খাওয়া খেয়ে চলে যান, তাহলে গগনবাবুর অপমান হবে, নিন্দে হবে এবং

ক্ষতিও হতে পারে। যদি ফরাস-পাতা আসরে বসবার যোগ্য কোন সাধারণ একজন ভুলক্রমে চেয়ার পাতা আসরের বিশিষ্টদের মধ্যে মিশে যান এবং হলঘরে বসে খেয়ে যান, তাহ'লে হিসেব করা আনারসের চাট্‌নি, পায়েস ও রাবড়ির ওপর মাত্রাছাড়া আঘাত পড়বে। এর ওপর যদি আবার মানবজাতির সেই ভয়ানক তৃতীয় শ্রেণীর কিছু ফাঁকতালে এ-আসর অথবা ও-আসরের মধ্যে ঢুকে পড়বার সুযোগ পায়, তাহলেই তো কথাই নেই, সব বে-হিসাব হয়ে যাবে।

কাজেই সাবধান থাকতে হবে, সাধারণের কেউ যেন ভুলে চেয়ার-পাতা আসরে ঢুকে না পড়ে এবং অসাধারণের কেউ যেন ভুলে ফরাস-পাতা আসরে গিয়ে বসে না থাকেন। আর, অনাহূত কোন দুর্দান্ত লোভী যেন কোন কৌশলে কোন মতেই কোন আসরে ঢুকে পড়তে না পারে।

দুরূহ দায়িত্ব, তবু খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন বড় পিসে-মশাই আর ন'মামা। মানুষ চিন্‌তে হবে। চেনা-অচেনা, ফর্সা কালো, বৃদ্ধ ও তরুণ প্রত্যেকেরই শুধু বাহিরটা দেখে ভিতরটা বুঝে ফেলতে হবে।

প্রবেশ-পথের মাঝখানে টিকিট-চেকারের মত পথটা আটক ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকেন বড় পিসেমশাই আর ন'মামা। আগন্তুকের সাজ-পোশাক, চলবার ভঙ্গী এবং চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারছিলেন, কে কোন দরের মানুষ। কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। মানুষ চিনতে কোন ভুল হচ্ছে না। সাধারণদের চিনে ফেলা মাত্র ট্রাফিক পুলিসের মত ভঙ্গীতে হাত তুলে ফরাস-পাতা আসর দেখিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অসাধারণদের চিনে ফেলা মাত্র হাত জোড় ক'রে চেয়ার-পাতা আসরের দিকে সাগ্রহে পাইলট ক'রে আন্‌ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, আসছেন কেমন-রকমের একজন

মানুষ। বড় পিসেমশাই আর ন'মামা দুজনেই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছিলেন, একটা লোক ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিল, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে ফরাস-পাতা আসরে ঢুকে পড়লো। এখন আবার ফরাস-পাতা আসরের ভেতর থেকে লোকটা বের হয়ে এই দিকেই আসছে, চেয়ার-পাতা আসরের দিকে যাবার জন্যে। এ আবার কেমন মানুষ?

দোহারা চেহারার লোকটা, একটু কম বয়সের মনে হয়েছিল, কিন্তু কাছে আসতেই কপালের রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যে, বয়েসটা অন্ততঃ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের কম নয়। মাথার চুল খুবই কালো আর গায়ের রঙও বেশ কাল। সাজটা কিন্তু ধবধবে সাদা। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ফরাসডাঙ্গা ধুতি, পায়ে সাদা চামড়ার নাগ্‌রা। কোঁচাটা পাঞ্জাবির পকেটে গোঁজা, থরে থরে কুঁচি করা কোঁচার প্রান্তভাগ জাপানী পাখার মত পকেটের ভেতর থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে রয়েছে।

বাধা দিতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে এবং একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে, লোকটা কোন্ শ্রেণীর মানুষ। ফরাস-পাতা আসর ছেড়ে চেয়ার পাতা আসরের দিকে যেতেই বা চাইছে কেন? কিন্তু কিভাবে কোন্ কথা বলবেন, এবং কেমন করে বাধা দেবেন, ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না বড় পিসেমশাই আর ন'মামা।

লোকটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু বাধা দেবার অথবা লোকটার মনুষ্যত্ব লক্ষ্য করবার কায়দাটি ঠিক ভেবে উঠতে পারছিলেন না দুজনের কেউ। হঠাৎ দুজনেরই চোখে পড়ে, লোকটার পিছু পিছু স্যাণ্ডোদলের পাঁচজন যেন ছায়ার মত নিঃশব্দে অনুসরণ করে আসছে। মাস্কুলার নেপাল তার হাতুড়ির মত হাত তুলে একটা ইশারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন বড় পিসেমশাই আর ন'মামা, কারণ নেপালের ইশারার অর্থটা ভাল করেই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

এতক্ষণে একটা লোককে আবিষ্কার করা গেছে, যে লোক কোন আসরেরই লোক নয়। অবাঞ্ছিত এবং অনাহূত সেই ভয়ংকর কপট অতিথিদলেরই একজন, যাদের ধরবার জন্য স্যাঙোদল বিয়েবাড়ির নানাদিকে এতক্ষণ নজর রেখে ঘুরছিল। এতক্ষণের চেষ্টায় মাত্র একজনকে চিন্‌তে পারা গেছে। চেন্‌বার মত কতগুলি প্রমাণও পাওয়া গেছে। ঐ লোকটাই তো কিছুক্ষণ আগে বড় রাস্তার পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছিল এবং বঙ্কুর কাছেই জিজ্ঞাসা করেছিল, এ বাড়িটা কার বাড়ি, কার মেয়ের বিয়ে, বর আস্‌ছে কোথা থেকে, বরযাত্রীরা কি এসে গেছে?

লোকটা সাম্‌নে এসেই অত্যন্ত সহজভাবে হাসতে থাকে এবং মাথা নেড়ে বলে—নাঃ, গগনদার টিকিটিরও আজ আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, এতই ব্যস্ত!

দু' চোখ বিস্ফারিত করে ন'মামা জিজ্ঞাসা করেন—কি বললেন? কার নাম করলেন?

ন'মামার প্রশ্ন শুনেই লোকটা চম্‌কে উঠ্‌লো মনে হলো, পর-মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে এবং উদ্‌গ্রীব সারসের মত গলা টান করে চেয়ার-পাতা আসরের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—অ্যাঁ, আমাদের স্যারও দেখি এসে গেছেন!

বল্‌তে বল্‌তে বড়-পিসেমশাইয়ের পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে চলে এসে লোকটা চেয়ার-পাতা আসরে প্রবেশ করে এবং বিরাটকায় দত্তবাবুর পাশের চেয়ারে বসেই জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন?

দত্তবাবু সম্ভ্রমের সুরে বলেন—আজ্ঞে ভাল আছি। আপনি?

লোকটা বলে—ভালই আছি আপনাদের আশীর্বাদে।

বড় পিসেমশাই, ন'মামা আর স্যাঙোর দল হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকে, লোকটা তেপায়া টেবিলের ওপর থেকে স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট তুলে নিল এবং দত্তবাবুর কাছ থেকেই দেশলাই চেয়ে

সিগারেট ধরালো। চেয়ারের ওপর একটু আয়েস করে কাত হয়ে ব'সে এবং পা ছড়িয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো লোকটা. এই অঘ্রান মাসের দিনে ফিন্‌-ফিনে একটা গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি ! অদ্ভুত !

মাস্ক্যুলার নেপাল বলে—কি রকম বুঝ্‌ছেন পিসেমশাই ?

বড় পিসেমশাই—কিছুই বুঝতে পারছি না। বোধ হয় স্টুয়ার্ট এণ্ড মিলারের পার্‌চেজিং ডিপার্টমেণ্টের সিনিয়র গ্রেডেরই কেউ হবে, নইলে দত্তবাবুর সঙ্গে এতটা মাখামাখি··· ।

ন'মামা বলেন—কিছু বলা যায় না দাদা, অলীক চেনা বড় কঠিন।

বড় পিসেমশাই—কিন্তু কি করা যায় বলুন দেখি !

বড় পিসেমশাই আর স্যাণ্ডোদলকে এই বিমূঢ় অবস্থা ও সমস্যা থেকে আপাততঃ মুক্তি দিলেন স্বয়ং গগনবাবু। হাত জোড় করে চেয়ার-পাতা আসরে সমাসীন বিশিষ্ট সজ্জনদের খাবার জন্য আহ্বান জানালেন। আহূত সজ্জনেরা একে একে উঠে হলঘরের ভেতর টেবিল-পাতা খাবারের আসরে গিয়ে বস্‌লেন। ফ্লানেলে ঢাকা বিরাটকায় দত্তবাবুর সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবিও উঠে গিয়ে খাবার টেবিলে বস্‌লো। হতাশ হয়ে পড়্‌লো স্যাণ্ডোদল। মাস্ক্যুলার নেপাল হাতুড়ির মত হাতের আঙুল মট্‌কে আক্ষেপ কর্‌লো—আর কোন আশা নেই। লোকটা অলীক নয় বলেই বোঝা যাচ্ছে।

ন'মামা বললেন—না হে, তবু নজর রাখ। চালচলনেই ধরা পড়ে যাবে যত পাকা অলীকই হোক্‌ না কেন। এখুনি আশা ছেড়ে দিও না নেপাল।

হলঘরের বিশেষ খাবারের আসরে বিশিষ্টদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে এবং দই-সন্দেশও পরিবেশন করা হয়ে যায়। তবু নজর রাখছিলেন বড় পিসেমশাই, ন'মামা আর স্যাণ্ডোর দল হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, দুর্গদ্বারের সতর্ক প্রহরীর মত, কারণ সেই লোকটা,

সেই গিলে-করা আদ্দি তখনো একমনে হাত চালিয়ে লুচি দিয়ে মাছের কালিয়া খেয়ে চলেছে।

মাছের কালিয়া শেষ করে দইয়ের খুরি কাছে টেনে নিয়ে গিলে-করা আদ্দি পরিবেশক পটলদার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে রান্নার সুখ্যাতিও করে—মাছের কালিয়াটা সত্যিই অতি উপদেয় হয়েছে।

গিলে-করা আদ্দির ভাষার আঘাতে খাইয়েদের ভ্রূভঙ্গীর ব্যাকরণও কৌতুকে একটু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করে স্যাঙাৎের দল, বড় পিসেমশাই আর ন'মামা। চোখে চোখে শাণিত সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

মাস্ক্যুলার নেপাল অস্থির হয়ে ওঠে—এখুনি ব্যাটাকে ঘাড়ে ধরে তুলে নিয়ে আসি, আর দেরি করা চলে না।

বড় পিসেমশাই একটু বিব্রতভাবে ন'মামাকে জিজ্ঞেস করেন—আপনি কি বলেন?

ন'মামা হতাশভাবে বলেন—আর ওসব ক'রে লাভ কি? সন্দেশ পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছে, বাকি আছে আঁচানো।

নেপাল উত্তেজিত হয়।—কিন্তু এরকম একটা জোচ্চোরের গায়ে একটা টোকা পর্যন্ত না মেরে বেমালুম ছেড়ে দেবেন?

ন'মামা—কখ্খনো না। আঁচিয়ে নিক্, তারপর। লোকজনের সামনে হল্লা না বাধিয়ে, বরং একটু আড়ালে গিয়ে একটু বাগে পেয়ে নিয়ে তারপর…।

দরজা ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে যায় স্যাঙাৎের দল, বড় পিসেমশাই আর ন'মামা। এবং খাওয়া শেষের পর আঁচানো শেষ করে গণ্য-মান্যের দলও আবার বাইরের রোয়াকে চেয়ার-পাতা আসরে এসে ভিড় করতে থাকেন। কেউ পান চিবোন, কেউ ঢেঁকুর তোলেন, কেউ সিগারেট ধরান। যাঁর সঙ্গে যাঁর খুশি, গল্পে ও বার্তালাপে মেতে

ওঠেন। সকলেরই কথায়, আচরণে, হাসিতে এবং চাঞ্চল্যে একটা বাঁধভাঙা অবস্থা।

গিলে-করা আদ্দিও চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে কি যেন দেখে, সাদা নাগরা-জোড়ার ভেতর তার কালো কালো পা-জোড়া ঢুকিয়ে নিয়ে কিসের জন্য যেন প্রস্তুত হয়।

একটা হুল্লোড় জাগে ফরাসপাতা আসরেও, তেতলার ছাদ থেকে একটা খাইয়ের দল খাওয়া শেষ করে এঁটো হাতে নেমে আসছে সিঁড়ি ধরে। ফরাস-পাতা আসরের প্রতীক্ষমান দলটা মুহূর্তের মধ্যে উঠন্ত হয়ে এবং প্রায়-দৌড়ে গিয়ে নামন্ত জনতাকে যেন চার্জ করে। এঁটো জনতার গায়ের ওপর দিয়ে খাইয়েদের দ্বিতীয় ব্যাচ্ মরিয়া হয়ে তেতলার দিকে ছুটে উঠতে থাকে। চারদিকে একটা হৈ হৈ শব্দের অরাজকতা, সবদিকে যেন বেশ একটা অসাবধানতা, চাঞ্চল্য আর বেসামাল ভাব।

দূরের ফটকটার দিকে তাকিয়ে গিলে-করা আদ্দির চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করে। যেন মুক্তির পথ এতক্ষণে অবারিত হয়েছে। ফটক লক্ষ্য ক'রে সবেগে দৌড় দিল গিলে-করা আদ্দি।

কিন্তু কয়েক পা'র বেশি আর দৌড়তে হলো না। নিকটেরই একটা থামের আড়াল থেকে চিতে বাঘের মত এক লাফে এগিয়ে এল নেপাল এবং দুটি মাস্ক্যুলার হাতে জড়িয়ে ধরলো গিলে-করা আদ্দির কোমরটা। তার পরেই প্রচণ্ড একটা ধোবিয়া আছাড়ের প্যাঁচ দিয়ে শানের ওপর পট্‌কে চেপে ধরলো গিলে-করা আদ্দিকে। এ পাশ আর ওপাশ থেকে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এল বঙ্কু, হাবুল, অশেষ আর আলোক। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বড় পিসেমশাই আর ন'মামা, ঘুষি পাকিয়ে এবং চোখ পাকিয়ে।

বঙ্কু চিৎকার করে—আগে হাত দুটোকে শক্ত ক'রে দুমড়ে ধর্ নেপাল, যেন কোমর থেকে ছুরি বের করতে না পারে।

গিলে-করা আদ্দির হাত দুটোকে মুচ্ড়ে পিঠের ওপর চড়িয়ে দিল নেপাল।

গিলে-করা আদ্দির বড়-বড় চুলের ঝুঁটি ধরবার জন্যে হাত কাঁপাতে থাকেন ন'মামা এবং বঙ্কু একটা চড় তুলে ধরে তার লম্বা হাতে। কিন্তু ঘটনাটা এত তীব্র ও দ্রুত জমে উঠতে গিয়েও হঠাৎ একটা বাধা পেল। বিরাটকায় দত্তবাবু তাঁর ফ্লানেলে ঢাকা ভুঁড়ির ওপর হাত চেপে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালেন।—ছি-ছি-ছি, কি কুৎসিত ব্যাপার! ভদ্রলোককে তোমরা এরকম ......।

গিলে-করা আদ্দিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নেপাল এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বলে--ভদ্রলোক নয় স্যার, এটা একটা অলীক।

দত্তবাবু বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে বলেন—অলীক? তার মানে?

নেপাল—নেমন্তন্ন হয়নি, অচেনা অজানা লোক, ভাঁওতা দিয়ে সাঁটিয়ে খেয়ে নিয়ে সট্‌কে পড়্‌ছে স্যার।

গিলে-করা আদ্দি দু'হাত দিয়ে নাকমুখ ও কপাল চেপে, যেন শুধু পিঠের ওপর সব মার বরণ করবার জন্যে তৈরী হয়ে মাটির ওপরে বসে ছিল, ধূর্ত শেয়াল যেমন চাষার লাঠির সম্মুখে গুটিসুটি হয়ে মরার ভান করে পড়ে থাকে। গিলে-করা আদ্দির আরও কাছে এগিয়ে এসে দত্তবাবু দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে সকলকে সরে যেতে বললেন—যেতে দাও, যেতে দাও।

তেতলার ছাদে খাইয়েদের হুল্লোড় শোনা যায়। অন্তঃপুরের অন্তর থেকে শঙ্খধ্বনি, আর আকুল ললনাকুলকণ্ঠ হতে উলু রব। একটা লুচি-লুচি গন্ধও চারিদিকে থৈ থৈ করে ওঠে।

দত্তবাবু বলেন—দুটো খেয়েছে, এইতো? তা'তে কি হয়েছে? যেতে দাও, কিছু বলো না।

কাউকে কিছু আর বলতে হলো না। গুটিসুটি গিলে-করা আদ্দি

হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে এবং সটান দৌড় দিয়ে ফটক পার হয়ে যেন তারিণী মিত্তির রোডের বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়।

অঘ্রানের রাতে উল্টাডিঙ্গির খালের ওপর ছোট ছোট কুয়াশার স্তবক ভাসে, তারিণী মিত্তির রোড এখান থেকে অনেক দূরে। খালের পাশে পাশে পথ ধ'রে হেঁটে চলেছে অলীক—গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ফরাসডাঙ্গা ধুতি আর সাদা নাগ্‌রা দিয়ে তৈরী লোকটা।

মুচিদের ছোট বস্তিটা ডাইনে রেখে আরও কিছুদূর এগিয়ে যেয়ে অলীক একবার থামে, পথের পাশে একটা টিউব-ওয়েলের পাম্পের হাতলটা ধরে চাপ দেয়। বেশ জোর লাগে এবং জোর দিতে গেলে ঘাড়ের মাংসপেশীগুলিও থর্‌থর্‌ করে। সবই ভুলে গিয়েছিল অলীক, এতক্ষণে মনে পড়ে, তারিণী মিত্তির রোডের সেই ষণ্ডাটা তার হাত দুটোকে কিভাবে বলির পাঁঠার ঠ্যাঙের মত মুচড়ে দিয়ে একেবারে পিঠের ওপর তুলে দিয়েছিল।

টিউব-ওয়েলের জল ঝলক্‌ দিয়ে উঠ্‌তেই আঁজলা তুলে জল ধরে অলীক। ঘাড়ের দু'পাশটা জল দিয়ে মালিশ করে, তারপর চল্‌তে থাকে।

সোজা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে আরও ছোট এবং গোবরমাখা একটা পথে নেমে পড়ে অলীক। পাশেই মহিষের খাটাল, পেছল হয়ে আছে ধরাতল, তবু পিছ্‌লে পড়ে না অলীক, স্বচ্ছন্দে চল্‌তে থাকে। এবার দেখা যায়, অনেকগুলি খোলার ঘর, মাঝে মাঝে এক একটা দালানবাড়িও আছে। চল্‌তে চল্‌তে একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়ায় অলীক। ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেন।

গলির ভেতরে ঢুকে কয়েকটা ঘর পার হয়েই একটা ঘরের দরজায় কড়া নাড়ে অলীক। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। কেরোসিনের একটা বাতি হাতে, লাল-পেড়ে শাড়ি এবং টিকালো নাকে নাকছাবি

একটি শীর্ণকায় নারী-মূর্তি গৃহাগত অলীকের মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করে—আজ আবার এত দেরি করলে যে ?

একমুখ হাসি হেসে ঘরে ঢোকে অলীক এবং আদ্দির পাঞ্জাবিটা সাবধানে গা থেকে খুল্‌তে খুল্‌তে উত্তর দেয়—আজকের মিটিং-এ ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল বউ, সাম্‌লাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

নাকছাবি বলে—এমন মিটিং-এ না গেলেই নয়।

—না গেলে আমার কোন ক্ষেতি নেই, কিন্তু আর পাঁচজনের ক্ষেতি হয় বউ।

ছাড়া পাঞ্জাবিটাকে আস্তে আস্তে মেজের ওপর রাখে অলীক। নাগ্‌রা জোড়া খুলে ঘরের কোণে সযত্নে রাখে। ফরাসডাঙ্গা ছেড়ে গাম্‌ছা পরে। পালক ছাড়ানো একটা পাখির মতই দেখায় অলীককে—কতটুকু দেখতে, কত দুর্বল এবং কি রোগা একটা মানুষের শরীর!

নাকছাবি প্রশ্ন করে—মিটিং-এ মারামারি হয়েছিল বুঝি ?

অলীক—হতে দিলাম আর কই ? যখন মিষ্টি কথায় কেউ শান্ত হলো না, তখন আচ্ছা ক'রে ধমক দিয়ে দু'দলকে দু'দিকে সরিয়ে দিলাম।

নাকছাবি—কি নিয়ে ঝগড়াটা বাধলো ?

অলীক—ঐ, সেই কনটোল নিয়ে। একদল স্বদেশী বলে কনটোল চাই, আর একদল স্বদেশী বলে চাই না। শেষ পর্যন্ত আমাকেই মাঝখানে পড়ে একটা আপোস করিয়ে দিতে হলো।

নাকছাবি—কি আপোস হলো ?

অলীক—মাসে পনরদিন কন্‌টোল থাক্‌বে, আর পনরদিন থাকবে না। তারপর আবার পনরদিন কন্‌টোল, এইরকম আর কি! দু' দলই খুশী হলো।

কুলুঙ্গি থেকে একটুক্‌রো কাপড়-কাচা সাবান তুলে হাতে নেয়

অলীক এবং একটা নারকেলের আঁচি নেড়ে চেড়ে আক্ষেপ করে—এঃ সোডাটা যে তোর কাঁথা কাচতেই একেবারে শেষ করে দিয়েছিস বউ, এখন আমি করি কি বল্‌তো।!

নাকছাবি বিরক্ত হয়। —এই মাঝ রাতে আবার কাচাকাচি অরম্ভ হলো? মরণ আমার!

এক হাতে জলের বাল্‌তি এবং এক হাতে একটা লোহার রড নিয়ে অলীক দরজার দিকে এগিয়ে যায়। গলি পার হয়ে পাকা রাস্তার কিনারা থেকে একটা হাইড্রেন্টের মুখ খুলে জল আন্‌তে হবে। যেতে যেতেই বলে—স্বদেশী বেটাদের ধস্তাধস্তির মধ্যে পড়ে জামাকাপড়ে বেশ ময়লা লেগেছে বউ। এক্ষুণি কেচে না রাখ্‌লে দাগগুলো পেকে যেতে পারে। কাল আবার মিটিং-এ যাবার সময় যাতে…।

নাকছাবি বাধা দিয়ে অপ্রসন্নভাবে বলে—কালও আবার মিটিং আছে নাকি?

অলীক—আছে, এই অঘ্রান মাসের মধ্যেই আরও চারটে মিটিং-এর দিন আছ; তার পরেই কিছুদিন আবার রেহাই পাওয়া যাবে।

নাকছাবি এইবার রাগ ক'রে একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বলে—তাহলে এই অঘ্রান মাসের মধ্যেই আমার মরণ হবে, চিতের জন্যে কাঠ যোগাড় কর।

দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে অলীক একটু বিব্রত ভাবে প্রশ্ন করে—তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন বল্‌ দিকি?

নাকছাবি—এ মাসটা শুধু মিটিং ক'রে যদি কাটিয়ে দাও তো কেলাবে যাবার ফুরসৎ পাবে কখন, আর পাওনা কোমিশোনের টাকাগুলোই বা আন্‌বে কখন্‌?

বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নাকছাবির কণ্ঠস্বর।—ঘরে দু'কুড়ি ঘুঁটে পর্যন্ত নেই যে, এই পোড়াকপালে আর একটু আগুন

দেব। মুচিমাগীদের কাছে হাত পেতে ধার ক'রে মরছি, আর দেবে না বলে দিয়েছে। এ মাসটা চালাবো কি ক'রে?

গলির বাইরে অন্ধকারের দিকে একবার দু'চোখ তুলে তাকায় অলীক, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে রুষ্টা নাকছাবির দিকে তাকায়। অতি শান্ত ও কোমল কণ্ঠস্বরে অনুনয় ক'রে অলীক বলে—একটু আস্তে কথা বল বউ, অবুঝ হোস্‌নি।

তারপরেই আরও কোমল স্বরে অলীক আবেদন করে—চালিয়ে নে বউ, এই অঘ্রান মাসটা কোন মতে চালিয়ে নে। শুনেছি পৌষ মাসে কোন মিটিং-এর তারিখ হয় না। এ মাসটা শেষ হলেই কেলাবে যাব আর কমিশনও নিয়ে আসবো।

লালপেড়ে শাড়ি, টিকালো নাকে নাকছাবি, শীর্ণকায় নারীমূর্তি অলীকের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অন্যরকম হ'য়ে যায়। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন মমতামন্থর হয়ে ওঠে। এমন মানুষকে গঞ্জনা দিয়ে আর লাভ কি? দশজনের উপকার করবার শখে এমনই মেতে আছে যে, নিজের হাঁড়ির জন্যে দুমুঠো চাল-ডালের পয়সাটাও রোজগার করে আন্‌বার সময় পাচ্ছে না। সময় মত ভাত পায় না, পেলেও পেটভরার মত হয় না, পূজো-পার্বণের দিনেও দু'টো ক্ষীর-ছানার জিনিস পেটে পড়ে না। তবুও কি মানুষটা কোনদিনও মনের দুঃখে একটুও রাগ করলো? ভগবানের যেন চোখ নেই, নইলে এমন মানুষ কষ্ট পায়?

আদুড় গা, রোগা এতটুকু একটা শরীর, পরিধানে ছোট একটা গাম্‌ছা, এক হাতে একটা লোহার রড এবং আর এক হাতে বাল্‌তি—দাঁড়িয়েছিল অলীক দরজার চৌকাঠের কাছে। কেরোসিনের বাতির ধোঁয়াটে আলোর মধ্যে কেমন একটা ছায়া-ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সংসারবিবাগী একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি। অলীককে যেন নতুন করে চেন্‌বার চেষ্টা করছে তার বিশ বছরের জীবন-সঙ্গিনী, এই লালপেড়ে

শাড়ি আর টিকালো নাকে নাকছাবি। বিশ বছর ঘর করেও মানুষটাকে যেন সে ঠিক চিনে উঠ্‌তে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে ভুল হয়। তাই এমন সন্ন্যেসীর মত যার মন—রাগ নেই, লোভ নেই এবং দুঃখ করে না, এমন একটা মানুষকেও কতবার কত কটু কথা বল্‌তে হয়েছে। কিন্তু ভগবানও কি ওকে চিন্‌তে ভুল করেছে? নইলে মানুষটাকে দিনরাত এমন একটা হাভাতে অদেষ্ট সহ্য করতে হয় কেন?

খুবই আস্তে আস্তে এবং শান্তস্বরে নাকছাবি বলে—মিটিং থেকে কিছু খেয়ে ফিরেছ তো?

অলীক—না।

নাকছাবি—তাহলে দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে দিই?

অলীক—আরে না, না। ওসব কিছু করিস্ নি। তুই তো জানিস্ মিটিং-এ-গেলে আমার ক্ষিদে মরে যায়। এখন খেলে অসুখ করবে।

জল আন্‌তে বের হয়ে যায় অলীক। মেঝের ওপর মাদুর পেতে এবং মাথার নিচে ছোট একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি গুঁজে দিয়ে শীর্ণকায় লালপেড়ে শাড়িও শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত মনে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়্‌তেও আর দেরি হয় না।

অঘ্রানের রাত আর একটু গভীর হয়। উল্টাডিঙ্গির খালের কুয়াশা রাতের আকাশে ক্রমেই ওপরে ওঠে। ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনে এক অলীকের ঘরের দরজার বাইরে একখণ্ড তক্তার ওপর কাপড় কাচার শব্দ আছাড় খেয়ে পড়্‌তে থাকে। তার ঐ আদ্দি, ফরাসডাঙ্গা আর নাগ্‌রার ধবধবে সাদার ওপর একটুও ময়লার দাগ সহ্য করতে পারে না অলীক।

রাত বাড়ছে। এখন শুধু এক দফা সাবান-কাচা ক'রে পাঞ্জাবি আর ধুতিটাকে খুব হাল্কা নীলের জলে চুবিয়ে রাখতে হবে। সকাল

হতেই আরম্ভ হবে আবার এবং প্রায় বিকেল পর্যন্ত চলবে অলীকের এই কাপড়চোপড় সাদা ধবধবে করার সাধনা।

এ কাজেও অলীক হাতটা পাকিয়েছে ভাল। ভোরে ঘুম ছেড়ে উঠেই সবার আগে একটা কাঠের গামলায় রিঠে ভিজিয়ে রাখে। তার পর কাচা পাঞ্জাবি আর ধুতিটাকে এক দফা ছায়ায় এবং আর এক দফা রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। কলপ দেওয়া বাকি থাকে, যতক্ষণ না টিকালো নাকে নাকছাবি এক বাটি ভাতের ফেন এনে দিয়ে যায়।

একটি আদ্দির পাঞ্জাবি এবং একটি ফরাসডাঙ্গা ধুতি ছাড়া আর একটি বস্তু আছে—একখানা মলমলের উড়ুনি। যেদিন একেবারে ভদ্রেশ্বর হতে হয়, মাঝে মাঝে দরকারও হয়, সেইদিন মলমলের উড়ুনিটাকে সাবান-জলে, রিঠে-ভেজানো জলে ও নীলের জলে চুবিয়ে এবং আছড়ে আছড়ে দুধের মত সাদা করে ফেলে অলীক। ইস্তিরি করা শেষ হয় দুপুরের মধ্যে এবং বিকেল হলেই আরম্ভ হয় গিলে করা। যখন শেষ হয় তখন সন্ধ্যে হবার আর বেশি বাকি থাকে না।

সন্ধ্যেটাই তো আসল সময়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যেন একটা ঘুমের মধ্যে কাজ করে অলীক। সত্যি ক'রে জেগে ওঠে তখন, সন্ধ্যে প্রদীপ যখন জ্বলে ওঠে ঘরে ঘরে, উল্টোডিঙ্গির খালের অলস নৌকাগুলির বুকের ভেতর এবং এত বড় কলকাতার পথে পথে।

রাতের আলো তবু সহ্য করতে পারে অলীক, কিন্তু দিনের আলোক একেবারেই না। সকালে বা দুপুরে ঘরের বার হলেই চোখে কেমন ধাঁধাঁ লাগে। গায়ে রোদ লাগলে মাথা ঘোরে এবং গা-বমিও করে। রোদের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কবেই চুকিয়ে দিয়েছে অলীক, আজ প্রায় বিশ বছর হলো। ওর কাছে দিনের বেলাটাই হলো রাত্রির মত এবং রাত্রিটা হলো দিন। সারা দিনমান ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে অলীক, বের হবার কোন দরকারও হয় না।

যেমন বাইরে তেমনি ঘরে, অলীক একেবারে খাঁটি অলীক।

বাইরের জগৎ ওকে চেনে না এবং ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের এই ক্ষুদ্র স্যাতসেঁতে ও অন্ধকারময় ঘরটাও তাকে চেনে না। ঘরের মেঝেতে মাদুরের ওপর এই অঘ্রানের রাতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রয়েছে যে লাল-পেড়ে শাড়িটা, অলীকের বিশ বছরের জীবনসঙ্গিনী, একমাত্র সে-ই বোধ হয় শুধু স্মরণ ক'রে রেখেছে, সন্ন্যেসীর মত মন এবং গামছা-পরা ঐ হাড়-সার রোগা মানুষটার দেশ কোথায়, নাম কি এবং বাপের নামটাই বা কি?

কিন্তু এটা কি একটা পরিচয় হলো? এবং সে ছাই বিশ বছর আগের পরিচয়েরও কি এখন আর কিছু আছে? বাড়িওয়ালা জানে, ওর নাম নুটবিহারী। লেনের বাসিন্দারা জানে, লোকটা হলো হরিপদ। মুদি জানে, উনি হলেন মহাদেববাবু। আর পুলিসের খাতায় যে কত নামে লোকটার পরিচয় লেখা আছে তার ইয়ত্তা নেই। এক একটা ঘটনার পরেই নাম-ঠিকানা হারিয়ে একেবারে নতুন একটা নামে যেন পুনর্জন্ম লাভ ক'রে এসেছে অলীক, একেবারে নতুন একটা ঠিকানায়। সরকারী হাতকড়া ও পরোয়ানা মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর শুধু খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছে। ধরা পড়েনি অলীক। কে ধরবে তাকে, যার নাম এত নশ্বর এবং ঠিকানা এত ক্ষণস্থায়ী? আসানসোল থেকে মগরাহাট, তারপর কিছুকাল কলকাতার শ্যামবাজারে। কিছুদিন রিসড়ে, তারপর নৈহাটী এবং অধুনা এই ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেন। পালাতে পালাতে এবং লুকোতে লুকোতে এমনি করেই বিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে অলীক। কপালের রেখায় রেখায় বয়সের হিসেবটাও স্পষ্ট করেই ফুটে উঠেছে।

কিন্তু আজও বিশ বছরের ঘরণী ঐ টিকালো নাকে নাকছাবিরও সাধ্যি হয়নি যে অলীকের খাঁটি পরিচয়টুকু বুঝতে পারে। বুঝবার সুযোগও দেয়নি এই শান্ত-দান্ত সন্ন্যাসীর মত মানুষটা। বছর কয়েক

আগেও মানুষটার বয়সটা যখন আরও কম ছিল এবং শরীরটাও এত রোগা ছিল না, তখন মাঝে মাঝে দিন কয়েকের জন্তে ঘর থেকে উধাও হয়ে যেত। ফিরে আসতো কিছু কাপড়চোপড়, কিছু বাসনপত্র, কিছু টাকা-পয়সা এবং কিছু সোনা-রূপোর টুকরো-টাকরাও সঙ্গে নিয়ে। লালপেড়ে শাড়ি জানতো, স্বামী তার মফঃস্বলে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ ক'রে ফিরে এল। এ ছাড়া আর কিছু জানবার সুযোগ দেয়নি অলীক।

অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজটা ছেড়ে দেবার পর এবং শ্যামবাজারের এক গলিতে এসে বাসা নেবার পর কয়েকটা বছর প্রতি রাত্রেই ঘর থেকে বের হতো অলীক এবং ফিরে আসতো রাত শেষ হবার আগেই। লালপেড়ে শাড়ি জেনেছিল শুধু, স্বামী তার একটা নাইট ডিউটির চাকরি করছে।

কিন্তু জানলেও বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল লাল-পেড়ে শাড়ির। রহস্যময় নাইট ডিউটিকে সন্দেহ না করে পারেনি। সন্দেহ করতে করতে একদিন কেঁদেও ফেলেছিল লালপেড়ে শাড়ি।

সে রাত্রিটা ছিল শিবরাত্রি। বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল অলীক। হঠাৎ লালপেড়ে শাড়ি এসে বাধা দিয়ে হাত চেপে ধরলো অলীকের—যেতে দেব না।

—কেন, কি হলো ?

—কিছু বুঝি না মনে করেছ ?

—কি বুঝেছ ?

—চরিত্তির নষ্ট করা মানে নাইট ডিউটি।

হো-হো করে হেসে ওঠে অলীক—আরে আমার চরিত্তির থাকলে তো নষ্ট করবো ?

হাসি থামিয়ে তারপর একেবারে প্রমাণ দিয়েই লালপেড়ে শাড়িকে বুঝিয়ে দেয় অলীক।—চরিত্তির নষ্ট করতে হ'লে রেজের

বেলা ঘর থেকে টাকা নিয়ে বের হতে হয় এবং ফিরে আসতে হয় খালি হাতে। আমার মত খালি হাতে বের হলে আর টাকা হাতে ঘরে ফিরলে চরিত্তির নষ্ট করা হয় না, বউ। বুঝলি এবার ?

বুঝেছিল লালপেড়ে শাড়ি এবং আর কোন বাধাও দেয়নি। আর সন্দেহ করা দূরে থাক, শিবের মত স্বামীর ঘরমুখো অনুরাগের প্রমাণ পেয়ে সেদিন মনে মনে একটু গর্বিত না হয়েও পারেনি।

অনেক দিন আগে, সেই নাইট ডিউটির রাজত্বকালেই, তালতলায় একটা পূজোবাড়িতে ভিড়ের সঙ্গে মিশে একবার যাত্রাগান শুনতে হয়েছিল অলীককে। অভিমন্যুর মৃত্যুটা দেখবার জন্যে নয়, আশে-পাশের লোকগুলির পকেটগুলির দিকে তাকাবার জন্যে এবং একটা বাচ্চা মেয়ের গলার সোনার হারটার ওপর কারবার করবার জন্য। অভিমন্যুর মৃত্যুর সময় ভিড়ের চোখগুলি একটু ঝাপসা হয়ে উঠতেই কারবার শেষ ক'রে সরে গেল অলীক। চলে যাবার সময় চোখে পড়লো অলীকের, অভিমন্যুটা এরই মধ্যে উঠে এসে সাজঘরের কাছে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে আর হাসছে। আসরের লোকগুলি কিন্তু তখনো চোখের জল মুছছিল।

দেখতে ভালই লেগেছিল অলীকের। এই তো একটা খাঁটি মানুষের জীবন, যাত্রার অভিমন্যুর মত আসরের ভিড়কে কাঁদিয়ে দিয়ে সরে পড় এবং হেসে হেসে চা খাও।

খুব সম্ভব সংসারটাকে একটা যাত্রাগানের আসর বলেই ধরে নিয়েছে অলীক। এই আসরে প্রতি রাত্রির আলোকে আর অন্ধকারে তার এক একটি ভয়ানক অভিনয়ের আঘাতে কার কি সর্বনাশ হলো, তার জন্য কোন ব্যথা-বেদনা নেই অলীকের ভাবনায়। যাত্রার অভিমন্যুর মত পালা শেষ করেই অনায়াসে হেসে হেসে চা খেতে পারে।

কোন আক্ষেপ নেই অলীকের মনে। তার কাজের আঘাতে কে

বঞ্চিত হলো, কে দুঃখ পেল আর কে হায়-হায় করে উঠলো--পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখবার কোন কৌতূহল নেই। যা হলো তা পেছনেই পড়ে রইল, স্মৃতির বোঝা নামে কোন বালাই নেই অলীকের জীবনে। আজ পর্যন্ত কোন কাজের জন্য একবিন্দুও অনুতাপ হয়নি। ওর হৃৎপিণ্ডটাও যেন নিরেট বরফের চেয়েও সাদা, শক্ত ও ঠাণ্ডা। কোন উত্তাপেও গলে না, উত্তাপ লাগেই না বোধ হয়।

নাইট ডিউটির খাটুনি আর হয়রানির পালা অতীত হয়ে গেছে। সে বয়স নেই এবং সেরকম রাত-বেড়াতে দৌড়াদৌড়ি করে খাটবার সামর্থ্যও নেই। এখন মাঝে মাঝে একটা কেলাবে যায় অলীক এবং কমিশন নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি অলীক, স্বামীর কৃতিত্বে ও প্রেমে গরবিনী এই লালপেড়ে শাড়ীকে।

অনেক জেলের ভাত-খাওয়া এক দাগী ও ঘাগী ওস্তাদের একটি আড্ডা, অলীকের ভাষায় যার নাম হলো কেলাব। এই বে-আইনী আড্ডার কিছু কিছু মালপত্র আইন-সম্মত দোকানগুলির কাছে বিক্রি করিয়ে দিয়ে দু'দশ টাকা কমিশন পায় অলীক। তাই ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের একটা ক্ষুদ্র ঘরের নিভৃতে মাটির হাঁড়িতে কয়েক মুঠো প্রাণ-বাঁচানো চাল-ডাল সেদ্ধ হয়, এই কমিশনের পয়সার জোরে, এই কেলাবটা আছে ব'লে। এই সহজ সরল রোজগারেও মাঝে মাঝে বাধা দেখা দেয়, বেগ পেতে হয়। পুলিসের জ্বালায় কেলাবও প্রায়ই ঠিকানা বদলাতে বাধ্য হয়।

এই বাধার চেয়েও বেশি খারাপ একটা বাধা দেখা দিয়েছে আজকাল। বাইরের নয়, মনের। অলীকের ঐ মিটিং-এ যাবার শখ। কে জানে কেন, হয়তো বয়সটা একটু বেড়েছে বলেই। এত ঘন ঘন মিটিং-এ গেলে কেলাবে যাওয়া আর হয় না, রোজগার হয় না। মাঝে মাঝে দিন রাতের মধ্যে এক বেলাও উনুনে আগুন জ্বলে না,

হাঁড়ি খা-খা করে। উপোস শরীর নিয়ে লাল-পেড়ে শাড়ী মাছুরের ওপর পড়ে থাকে এবং ছুনিয়ার মিটিংগুলোর ওপর রাগ না ক'রে পারে না।

অলীকের শখ। যেন পৃথিবীর সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক পাতাবার শখ। জনতার সঙ্গে একটু মেশবার, পাঁচজনের সামনে গিয়ে বসবার, একটু সম্মান ও সমাদর পাবার শখ। মদ, গাঁজা, ভাং কত নেশার অভ্যেসই তো ছিল অলীকের এবং এখনো এক-আধটু আছে। কিন্তু আজকাল যেন আর একটু মৌতাতী নেশার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে জীবনে।

নতুন নেশা না বলে নতুন কারবারও বলা যায়। মূলধন হলো একটি মাত্র আদ্দির পাঞ্জাবি, একটি ফরাসডাঙ্গা ধুতি, এক জোড়া নাগরা এবং একটি মলমলের উড়ুনী—সবই সাদা। এই মূলধন সম্বল ক'রে একটা মস্ত বড় কারবারে হাত দিয়েছে অলীক। এ কারবারে পয়সা পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু যা পাওয়া যায় তার লোভ সামলানো বড় কঠিন। লোভটা বড় জোরে পেয়ে বসেছে অলীককে, তার এই প্রায়-প্রৌঢ় ক্লান্ত বয়সের জীবনকে।

বছরের মধ্যেই এমন এক একটা মাস আসে, যখন প্রায় প্রতি রাত্রে পাড়ায় পাড়ায় ঘরের ছুয়ারে শানাই বাজাবার লগ্ন দেখা দেয়। ছুর্দমনীয় একটা অকর্ষণ আছে এই শানাইয়ের শব্দে। ছাদের ওপর গোলপাতার চালা, কিংবা একটা রঙীন চাঁদোয়া—একটু বেশি ক'রে আলোকের ছড়াছড়ি, লোকের গায়ে গায়ে একটু বেশি করে সেণ্ট পাউডারের মাখামাখি—একটু বেশি. সুন্দর ক'রে সাজ করা, একটু বেশি করে হাসা—ছলুধ্বনি আর শঙ্খরব—তার ওপর চারদিকে একটা লুচি-লুচি গন্ধের আলোড়ন। লোভ সামলাতে পারে না অলীক। আদ্দি, ফরাসডাঙ্গা আর মল্‌মলে একেবারে সাদাটি হয়ে পৃথিবীর বিয়েবাড়ির ভিড়ে এসে ঢুকে পড়ে।

বিয়েবাড়ির লুচি সন্দেশে যেন অতিরিক্ত একটা স্বাদুতা আছে। আড্ডার ওস্তাদও তো কখনো-সখনো এসব জিনিস খাইয়েছে অলীককে এবং ভাল কমিশন পেলে অলীক নিজেও বৈঠকখানার বাজারে ভাল ময়রার দোকানে বসেই এসব জিনিস কিনে খেয়েছে। কিন্তু দোকানের সে-জিনিস ঠিক বিয়েবাড়ির এ-জিনিসের মত সুস্বাদু নয়।

কম সুস্বাদু নয়, বিয়ে-বাড়ির লোকজনগুলির হাসিমুখের অভ্যর্থনা। অলীক অতিথিকে একেবারে অকৃত্রিম মনে ক'রে কত ভাবে তুষ্ট করার চেষ্টা! এই তো সেদিন সুকিয়া স্ট্রীটের সেই এটর্ণীর মেয়ের বিয়েতে, এক ঘর বড়লোকের সঙ্গে একই খাবারের আসরে বসে খেয়েছিল অলীক! এটর্ণী মশায় অলীকের সামনে এসে হাতজোড় করে বললেন—যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তো মার্জনা করবেন।

—কিচ্ছু না, কোন ত্রুটি হয়নি, অতি সুন্দর ব্যবোস্তা হয়েছে।

অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে এটর্ণীর সব ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছিল অলীক। আনন্দ আছে এই সব অকৃত্রিমের সব ত্রুটি ক্ষমা করতে। মাত্র একটি নিষ্কলঙ্ক সাদা পোশাকের ছলনায় এই ভয়ানক সভ্য-ভব্য মানুষগুলির দু'চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়ে এবং এক একটা খাঁটি সমাদর আর অভ্যর্থনা চুরি করে নিয়ে সরে পড়তে আনন্দ আছে।

অঘ্রানের রাতে, ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনে একটা ঘরের দরজায় এক খণ্ড তক্তার ওপর কাপড় কাচার শব্দ বাজে। যেন তার বরফের হৃৎপিণ্ড থেকে সব দাগ এক রাতের মধ্যেই ধুয়ে মুছে একেবারে ধবধবে করে দিচ্ছে অলীক। পরের রাত্রির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। মনে পড়ে অলীকের, কালকের দিনটাও একটা বিয়ের দিন, এক রাতের মধ্যেই চারটে লগ্ন আছে।

হঠাৎ কাপড় কাচা থামিয়ে উৎকর্ণ হয় অলীক। গলির মুখে ভারি-ভারি বুট জুতোর এবং লাঠি ঠোকার শব্দ শোনা যায়

খাটালের দিকে কুকুরগুলো ডাকতে থাকে। এক লাফে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় অলীক।

অঘ্রান মাসে আরও চারটে মিটিং-এর তারিখ ছিল। এর মধ্যে তিনটি মিটিং স্বচ্ছন্দে এবং বেশ সাফল্যের সঙ্গে সেরে দিতে পেরেছে অলীক। একটা ভবানীপুরে, একটা টালিগঞ্জে এবং আর একটা শোভাবাজারে। কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

আজ হলো অঘ্রানের শেষ মিটিং-এর তারিখ। বড় জোরে শানাই বাজছে পাড়ায় পাড়ায়, বাজারে দই-মিষ্টির দর দ্বিগুণ এবং ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডগুলিও শূন্য! মানুষগুলি যেন মরিয়া হয়ে বিয়ে করছে চারদিকে।

ভালই হয়েছে। অলীকও আজ প্রায় মরিয়া হয়ে সেই সন্ধ্যে থেকেই সন্ধান করে ফিরছে একটা বেশ ভাল আর জাঁকালো রকমের বিয়েবাড়ি।

অনেকগুলি বিয়েবাড়ির দরজা থেকেই ফিরে গিয়েছে অলীক, ভেতরে ঢোকেনি, কারণ বিয়ে-বাড়ির চেহারাটাই পছন্দ হয়নি। এমন একটা বাড়ি চাই, যেখানে খুব বেশি করে সমাদর আর অভ্যর্থনার উৎসব আজ জেগে উঠেছে, গণ্যমান্য আর সভ্য-ভব্যের ভিড়ও হয়েছে খুব, ভোজনের আয়োজনও ভুরি প্রমাণ। অঘ্রানের শেষ মিটিং-এর সমাদর আর দই-সন্দেশ বেশ ভাল করে খেয়ে নিতে হবে। তাই মলমলের উড়ুনিটা পাকিয়ে এবং মালার মত গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে আজ একেবারে ভদ্রেশ্বর হয়ে উঠেছে অলীক।

একটা বিয়ে-বাড়িকে মনে ধরেছিল অলীকের, বেশ জাঁকালো রকমের ব্যাপার ভেতরে চলছে মনে হলো। কিন্তু ব্যবস্থাটা একটু অসভ্য রকমের। নিমন্ত্রিতের দল ফটকে এসে কার্ড দেখিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

হলো না। এ রাস্তাটাই ছেড়ে দিয়ে একেবারে অন্য একটা

রাস্তায় চলে গেল অলীক। পর পর আরও কয়েকটা শানাই-বাজা বাড়ি পড়লো। কিন্তু একটু সন্দেহভরা চোখেই বিয়ে-বাড়ির রকম-সকম দেখে দরজা থেকেই সরে গেল অলীক। মনে হলো তারিণী মিত্তির রোডের সেই লালরঙা বাড়িটার মত এখানেও ষণ্ডা ষণ্ডা কতকগুলি লোক কিরকম বিশ্রীভাবে চারদিকে চোখ রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চলতে চলতে একটা সিনেমা ঘরের বারান্দার দেয়ালের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে অলীকের। রাত ন'টা। মুহূর্তের মত বিষণ্ণ হয়ে ওঠে অলীক, তার পরে আরও ব্যস্ত হয়ে চলতে থাকে।

বিয়ের শেষ লগ্ন রাত দশটায়। বিয়েবাড়িগুলির উৎসবের আয়ুও ফুরিয়ে আসছে। ছটফট করে ওঠে অলীকের মন এবং ছটফট ক'রেই হাঁটতে থাকে। পথের পর পথ পার হয়ে এবং পাড়ার পর পাড়া ঘুরে ঘুরে একটা জাঁকালো রকমের বিয়েবাড়ির সন্ধান করতে থাকে অলীক। অঘ্রানের শেষ মিটিং-এর দিনটা এমন করে ফাঁকি দিয়ে ফুরিয়ে যাবে, সহ্য করা যায় না।

পথও জনবিরল হয়ে আসছে। সামনে পড়ে আশু পোদ্দারের গলি। গলি ধরে দ্রুতপদে হেঁটে যেতে থাকে অলীক ওদিকের বড় রাস্তাটায় পৌঁছবার জন্য। গলির একদিকে দালান বাড়ির সারি, আর একদিকটা ছোট ছোট বাড়ি, মাটির দেয়াল আর খোলার চাল।

দেখা যায়, গলির এই দীনহীন চেহারার বাড়িগুলির মধ্যেই একটা বাড়ির সামনে শানাই বাজছে, দুটো ট্যাক্সি এসে থেমেছে। ট্যাক্সি থেকে নামছে বর এবং গোটা দশেক বরযাত্রী। শাঁখ বাজিয়ে ছুটে এল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা সামলাতে সামলাতে বের হয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে একদল বউ। ফর্সা গেঞ্জি এবং ময়লা ধুতি প'রে কয়েকটা লোকও বর এবং বর-যাত্রীর দলকে অভ্যর্থনা করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অলীক। হাত দিয়ে পরিশ্রান্ত কপালের ঘাম মোছে। তারপরেই আর কোন দ্বিধা না ক'রে এই শ্রীনহীন চেহারার বিয়ে-বাড়িটারই ভেতর ঢুকে পড়ে।

বাড়ির ভেতরে একটা উঠোন আছে। উঠোনের একদিকে একটা গরুও বাঁধা রয়েছে দেখা যায়। আর একদিকে জায়গাটাকে নিকিয়ে আলপনা দেওয়া হয়েছে, দুটো পিঁড়ি আছে এবং একজন পুরুত ঠাকুরও বসে আছেন সেখানে তৈরী হয়ে।

উঠোনের এক পাশে একটা উঁচু বারান্দায় শতরঞ্চির ওপর বর এবং বরযাত্রীরা বসেছিল। বারান্দার পাশে দুটো ঘর, একটা ঘরের দরজা দিয়ে রান্নার ধোঁয়া বের হয়ে আসছে, আর একটা ঘরের ভেতরে বউ আর মেয়েদের ভিড়।

সটান ভেতরে ঢুকে বারান্দায় শতরঞ্চির ওপর বরযাত্রীদের কাছে বসে পড়লো অলীক। বরযাত্রীরা সসম্ভ্রমে এবং সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে বসে। অলীকের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আর একটু বেশি জায়গা করে দেয়।

বিয়েবাড়ির ফর্সা গেঞ্জি এবং ময়লাধুতি লোকগুলির মধ্যে একটা টাকমাথা প্রৌঢ় বয়সের লোক একটু চিন্তিতভাবে সাদা ধবধবে গিলে-করা আদ্দির দিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে টাকমাথা লোকটা বিয়েবাড়ির একটা কর্মব্যস্ত ছোকরার দিকে হাত তুলে কি যেন ইঙ্গিত করে। সতর্ক হয় অলীক, দরজার দিকে তাকায়।

একটা পাখা হাতে নিয়ে ছোকরাটা দৌড়ে এসে গিলে-করা আদ্দির গায়ে বাতাস দিতে আরম্ভ করে। মনের হাসি চাপতে গিয়ে মুখ ভরে হেসে ফেলে অলীক। আপত্তির সুরে বলে—থাক্, আমাকে আর বাতাস করতে হবে না।

এ আসরে সমাসীন সকল মূর্তির মধ্যে অলীকই একমাত্র রাশভারি, আর সবাই পল্‌কা। অলীকই একমাত্র ভদ্রেশ্বর, এমন

নিখুঁত সাদা ধবধবে সাজ আর কারও নেই, পাখার বাতাসের সমাদর ওরই গায়ে সবচেয়ে বেশি করে লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

এগিয়ে আসছে বিয়ের লগ্ন। কিন্তু বিয়েবাড়িটা কেমন যেন বোবা-বোবা হয়ে রয়েছে, উৎসবের কলরব ঠিক জাগছে না।

লক্ষ্য করে অলীক, কনেপক্ষের লোকগুলি কেমন যেন ভয় পেয়ে রয়েছে। সবচেয়ে ভীরু দেখাচ্ছে ঐ টাকমাথা ময়লা-ধুতিকে। ঐ লোকটাই বোধ হয় মেয়ের বাপ।

বরযাত্রীরাও কেমন গম্ভীর। তার মধ্যে সবচেয়ে গম্ভীর হলো, কালো একটা কোটের ওপর গরদের চাদর জড়ানো এবং খোঁচা-খোঁচা সাদা-পাকা দাড়ি এই লোকটা, অলীকের কাছেই যে বসে রয়েছে। নিশ্চয় বরের বাপ। অস্বস্তি বোধ করে অলীক।

হঠাৎ টাকমাথা লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এবং অলীকের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে বলে—একবার একটু এদিকে আসবেন ?

সন্ত্রস্তের মত চম্‌কে ওঠে অলীক—কেন ?

—একটা কথা নিবেদন করবার আছে।

টাকমাথার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে অলীকও তাকিয়ে দেখে একবার। তারপর বলে—চলুন।

বারান্দার আর এক প্রান্তে, যেন একটু নিরিবিলি আলাপ করার জন্যেই দাঁড়ালো টাকমাথা ময়লাধুতি, তার সঙ্গে গিলে-করা আদ্দি।

টাকমাথা বলে—আপনি তো সম্পর্কে হলেন গিয়ে ছেলের……।

অলীক—ছেলের কাকা। বর হলো আমারই জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে।

টাকমাথা বলে—আপনাকে দেখে একটু ভরসা পেয়েছি মশাই। দেখেই বুঝেছি, আপনার মত মানুষ কখনো অবুঝ হতে পারে না। যদি দয়া ক'রে ছেলের বাপকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে……।

অলীক—ব্যাপারটা একটু খুলে না বললে কিছুই বুঝতে পারছি না।

টাকমাথা—চুক্তির দেড়শো টাকা এখন আর দিয়ে উঠতে পারবো না।

অলীক বলে—বেশ তো, দেবেন না।

টাকমাথা করুণভাবে প্রশ্ন করে—না দিলে কি বর উঠবে?

মাথা হেঁট ক'রে অলীক কিছুক্ষণ মেজের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার টাকমাথার মুখের দিকে তাকায়। উত্তর দেয় না অলীক, এবং যেন এই অদ্ভুত ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মাথা চুলকিয়ে মনের ভেতর একটা পথ খুঁজতে থাকে।

টাকমাথার চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে—ওঁরা জানেন না, আপনিও জানেন না, বিয়ের খরচটা যোগাড় করতে আমাকে কি করতে হয়েছে। একটা গরু বেচেছি, অফিসের দারোয়ানের কাছ থেকে চার'শো টাকার হ্যাণ্ডনোট দিয়ে দু'শো টাকা যোগাড় করেছি। গিন্নীর হাতে যেটুকু সোনা শেষ পর্যন্ত টিঁকে ছিল তাই দিয়ে মেয়ের জন্যে রুলি জোড়া গড়িয়েছি। এখন বলুন ...।

অলীকের হাত চেপে ধরে টাকমাথা ময়লাধুতি।—আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনিই বলুন দেখি, পাখা-মিস্ত্রির কাজ ক'রে যার পেট চলে, সে লোককে যদি মেয়ের বিয়েতে তিনশো টাকা বরপণ দিতে হয়, তবে......।

অলীক—দেড়শো বুঝি আগেই দিয়ে ফেলেছেন?

টাকমাথা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুব জোরে হাই তোলে অলীক। একটু বেশি হাঁটাহাঁটিতে শরীরটা তো ক্লান্ত হয়েই আছে। বেশ তেষ্টা পেয়েছে। ক্ষিদেটাও পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে খুব জোরে। অথচ শাক-চচ্চড়ি যা খাওয়াবে তার ভরসাও একটা ফ্যাসাদে বেধে কিরকম গোলমাল হয়ে

যাচ্ছে। কি যে হবে তার ঠিক নেই। কি করা যায়, তাও বুঝে উঠতে পারে না।

টাকমাথা আবেদন করে—উদ্ধার করুন মশাই।

অলীক হেসে ফেলে—এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

টাকমাথা আবার আবেদন করে—বলুন, কি উপায় হবে?

অলীক—বিয়ে হবে, আবার কি হবে?

টাকমাথা—বর উঠবে তো?

অলীক—বরের চোদ্দপুরুষ উঠবে।

টাকমাথা—টাকাটা?

অলীক—সে ভার আমার।

টাকমাথা ময়লাধুতি সেই মেয়ের-বাপ কৃতজ্ঞতায় বিচলিত হয়ে আর-একবার অলীকের হাত চেপে ধরে। অলীক আরও স্পষ্ট করে আশ্বাস জানায়—আমি ওদের ব'লে ক'য়ে সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার কাছে কেউ টাকার দাবিই করবে না।

মুখের ভাষায় উত্তর দিতে না পেরে টাকমাথা ময়লাধুতি অলীকের হাতে মাথা ঠেকায়।

অলীক তার হাতটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে বলে—যান, এইবার বরযাত্রীদের ভালমন্দ যা'হোক কিছু খাইয়ে দেবার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি……।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভেতর মেয়েদের ভিড়ের কাছে গিয়ে চিৎকার করে টাকমাথা মেয়ের-বাপ—তৈরী হও, লগ্নের আর বড় বাকি নেই।

বারান্দার অপর প্রান্তে শতরঞ্জির ওপর সমাসীন কালো কোটের ওপর গরদের চাদর জড়ানো বরের বাপ চেঁচিয়ে বলে—টাকাটা যে বাকি আছে!

কালো কোটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একবার তাকায় অলীক।

তারপর ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে এবং গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেসা করে—কত টাকা ?

কালো কোট একটু অপ্রস্তুত হয়ে সম্ভ্রমের সুরে বলে—আজ্ঞে দেড়শো টাকা।

অলীক—কাল পাবেন ?

কালোকোট অপত্তি জানায়—কালকেই যে পাব এমন ভরসা কি ক'রে করি বলুন ? যে একবার কথা ভাঙ্গে সে যে আর একবার……।

অলীক—আমি কথা দিচ্ছি।

কালোকোট বিচলিত ও বিস্মিতভাবে তাকায়।—আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

অলীক—একবার আমার সঙ্গে বাইরে অস্থন, চিনিয়ে দিচ্ছি।

চোখ বড় ক'রে কালোকোট নিঃশব্দে এবং ভীতভাবে তাকিয়ে থাকে। অলীক তার কণ্ঠস্বর একটু নরম ক'রে নিয়ে বলে—আস্থন আস্থন, এক মিনিটের জন্যে অনুগ্রহ করে বাইরে আস্থন, তাহলেই চিনতে পারবেন।

দ্বিধা কাটিয়ে, কিন্তু একটু সন্দিগ্ধভাবে শতরঞ্জি থেকে উঠলেন কালোকোট। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই অলীক হাত তুলে দেখায়—ঐ যে দেখছেন, এ পাড়ারই শেষ বাড়িটা, ঐ যে ফটকে আলো জ্বলছে ?

কালোকোট বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অলীক—আমার বাড়ি, ভাল ক'রে চিনে রাখুন।

কালোকোট—চিন্‌লাম তো, কিন্তু…।

অলীক—কিন্তু টিন্তু কিছু নেই, কাল রাত্রে এক ফাঁকে সময় করে চলে আসবেন আমার কাছে, টাকাটা নিয়ে যাবেন।

এ পাড়ারই শেষ বাড়ি, গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে, যেখানে ছোট একটা পার্ক আছে, সেখানে ; বিরাট তিনতলা একটা বাড়ি,

ফটকের মস্ত মস্ত থাম দুটো এখান থেকেই স্পষ্ট করে দেখা যায়। বাড়িটার দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থেকে কালোকোট বলে—আজ্ঞে আপনার সঙ্গে দেখা করতে কোন অসুবিধে হবে না তো ?

অলীক—কিছু না। দারোয়ানকে বলবেন, ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান, তা'হলেই হবে।

কালোকোট—আজ্ঞে আমরা কাল সন্ধ্যে সাতটার সময়ে রওনা হব।

অলীক—ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় গিয়ে টাকা নিয়ে আসবেন।··· আর একটা কথা। মেয়ের বাপকে এসব কথা কিছুই জানাবেন না, শুনলে বড় লজ্জা পাবেন। শত হোক, একটা পিতিবেশী ছাড়া তো আমি আর কিছু নই।

ভেতরে ঢুকে আবার শতরঞ্জির ওপর হাসি-হাসি মুখ নিয়ে কৃতার্থভাবে বসলেন কালোকোট, তার পাশেই গিলে-করা আদ্দি। কালোকোট হাঁক দিয়ে বলে—কনে পক্ষ এবার তৈরী হলেই তো হয়, লগ্নের যে আর বড় বাকি নেই।

এতক্ষণে বিয়ে বাড়িতে একটা সাড়া জেগে ওঠে। একটু ব্যস্ততা, একটু চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ি। কালোকোটের সঙ্গে আলাপ করে গিলে-করা আদ্দি। ছেলের কথা তুলে কালোকোট বেশ গর্ব করে এবং নানা বৃত্তান্ত বলে। এই বয়সেই কোম্পানির হেড চাপরাশির পোস্টটা পেয়ে গেছে কালোকোটের কৃতী ছেলে। সাহেবদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে হয় ছেলেকে। তা ছাড়া, ছেলের মনটাও বড় শৌখীন, রাত জেগে নাটক-নভেল পড়ে।

এগিয়ে আসছে অগ্রান মাসের শেষ বিয়ের-লগ্ন। আর ভাল লাগছিল না অলীকের। এখন শাকচচ্চড়ি যা দেবার তা পাত পেড়ে দিয়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু এইটুকু একটা আঙিনা, আর এই তো সরু ফালির মত একটা বারান্দা। এর মধ্যে কোথায় যে খাবার আসর

হবে কে জানে? খাওয়াবে কিনা, তাই বা কে জানে? বর হলেন কোথাকার এক চাপরাশি এবং কনে হলেন কোন্ এক পাখা-মিস্ত্রির মেয়ে। এমন বিয়ের বাড়িতে যে লুচি-লুচি গন্ধ মেতে উঠবে, এমন ভরসা নেই।

টাকমাথা ও ময়লাধুতি, সেই মেয়ের বাপ হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসে অলীকের হাত ধরে?—আপনি একবার ভেতরে আসুন। না এলে চলবে না।

যে ঘরে মেয়ে আর বউয়ের দল ভিড় করে ছিল, সেই ঘরের ভেতরেই গিলে-করা আদ্দিকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো টাকমাথা। বউয়ের দল সসঙ্কোচে পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়, মেয়ের দল দু'চোখ তুলে আবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে গিলে-করা আদ্দির দিকে, ব্রতকথার দয়ালু রাজার মত মস্ত বড়লোক অথচ খুব ভাললোক অদ্ভুত এক বরের কাকার মুখের দিকে।

ঘরের মেঝেতে রঙীন চেলি পরে একটি মেয়ে দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে এবং মাথা হেঁট করে বসেছিল।

টাকমাথা বলে—মুখ তোল টুনি-মা, উঠে আয়, কাকাবাবু এসেছেন, প্রণাম কর।

মুখ তুলে তাকায় মেয়েটা। বাচ্চা বয়সের একটা মেয়ের মুখ, চন্দনের ফোঁটা আঁকা রয়েছে মুখের ওপর। চোখে কাজলও পরেছে এবং একটা টিপ আছে কপালে।

—আয় আয়, উঠে আয়। প্রণাম কর কাকাবাবুকে। উনি না থাকলে আজ কি যে হতো…।

বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে টাকমাথা। তারপর একটু শান্তভাবে বলে—মেয়েটা এতক্ষণ শুধু হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদেছে মশাই।

অলীক বিচলিতভাবে বলে—কেন, কাঁদবার কি হয়েছে?

টাকমাথা মৃদু হেসে জবাব দেয়—বিয়ে হবে না শুনেছে, তাই।

অলীক—কে বললে হবে না? কার সাধ্যি বিয়ে আটকায়?

মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে গিলে-করা আদ্দির পায়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে। শিরশির করে একবার কেঁপে ওঠে গিলে-করা আদ্দির পা'দুটো। অস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বলতে চেষ্টা করে, তারপর মেয়েটার মাথায় হাত দিতে জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে —লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, জন্ম এয়োতি হও।

প্রণাম করার পর অলীকের সামনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে টাকমাথা ময়লাধুতির মেয়ে, টুনি-মা। টাকমাথা বলে—আসল কথা কি জানেন, বাপের দুঃখ বুঝবার মত বয়স তো হয়েছে, তাই এসব গণ্ডগোলের কথা শুনেই কেঁদে ফেলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে গিলে-করা আদ্দিরও মনের ভেতরে কেমন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। সটান একটা হাত এগিয়ে দিয়ে টুনি-মার চিবুকটাকে যেন আদর-করার আবেগে ছুঁয়ে ফেললো অলীক। হেসে হেসে ভ্রূভঙ্গি ক'রে একটা ধমকও দেয়—খবরদার মেয়ে, কাঁদবে না বলে দিচ্ছি। আবার যদি কাঁদ বাছা, তুলে আছাড় দেব।

হেসে ফেলে টুনি-মা, চন্দনের ফোঁটা-আঁকা কচি একটা মুখ।

অলীকের অলীকত্ব আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। গলা ছেড়ে একটা উল্লাসের সুরে অলীক ঘরের ভেতর ঘোমটা-টানা বউগুলির দিকে তাকিয়ে বলে—উলু দিন, জোরে উলু দিন, সবাই এরকম বোবাটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

লগ্ন এগিয়ে আসছে। উলুধ্বনি জাগে, বরযাত্রীরা চঞ্চল হয়, বর উঠি-উঠি করে, পুরুত নড়ে চড়ে বসে। টাকমাথা ময়লা ধুতির কাছে ব্যস্তভাবে বিদায় চায় অলীক—আমাকে এবার বিদায় নিতে আজ্ঞা করুন কর্তা।

টাকমাথা—সে কি? এখুনি? না খেয়ে?

অলীক—খেতে পারবো না কর্তা।

টাকমাথা—তা হয় না, খেতেই হবে।

অলীকের মুখে সন্ত্রাসের ছায়া, জীবনে এই প্রথম অঘটন। যেন তাকে চারদিক থেকে কতগুলি অদৃশ্য প্রহরী আজ ভয়ানকভাবে পথ আটক করে ধরতে চাইছে। কথা বলতে গিয়ে ভাষা আর গলার স্বর একসঙ্গেই কেঁপে ওঠে আর্তনাদের মত—ছেড়ে দিন, যেতে দিন আমাকে। বাড়িতে আমার অফিসের লোক এসে বসে আছে, বড্ড জরুরি কাজ আছে।

গিলে-করা আদ্দির হাত শক্ত করে চেপে ধরে টাকমাথা ময়লা-ধুতি। চেঁচিয়ে বলে—যা তো টুনি-মা, ওঘর থেকে একটা ঠোঙায় করে দশটা সন্দেশ আর এক গেলাস জল চটপট নিয়ে এসে কাকা-বাবুকে খেতে দে।

এক মুহূর্তও দেরি করে না টাকমাথার মেয়ে টুনি-মা। সেখানেই মেজের উপর একটা আসন পাতে। একটা পেতলের রেকাবিতে সন্দেশ আর এক গেলাস জল নিয়ে এসে রাখে।

ঘন ঘন উলুর রব বাজে, বউয়ের দল কনেকে ডাকাডাকি করে। এগিয়ে আসছে লগ্ন, আর মোটেই সময় নেই। টুনি-মা তবু চন্দনের ফোঁটা-আঁকা মুখ নিয়ে অলীকের সামনেই বসে থাকে, কাকাবাবুর খাওয়া দেখে।

আর একবার খুব জোরে উলু বাজলো। বর উঠে গিয়ে বসেছে পিঁড়িতে।

অলীকের খাওয়া শেষ হ'য়েছে। আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সোজা দরজা পার হয়ে বেরিয়ে যায় অলীক। পিছু ফিরে একবারও তাকায় না। ধরা পড়তে হয়নি, কোন বাধা পায়নি, কিন্তু যেন ভয়ানক জখম হয়ে যন্ত্রণাক্ত মূর্তি নিয়ে ছুটে চলে গেল অলীক, সাদা ধবধবে গিলে-করা আদ্দি!

আজও সকাল থেকে সোডা সাবান আর রিঠে নিয়ে কাপড়-জামা কাচাকাচি আরম্ভ করেছে অলীক।

নাকছাবি জিজ্ঞেসা করে—আজও আবার মিটিং আছে নাকি?

অলীক—না না, আজ আর মিটিং-ফিটিং কিছু নেই।

নাকছাবি—তবে আবার এত কাচাকাচি শুরু করলে কেন?

অলীক—কালকের মিটিংএ ঘেমেছিলাম খুব, পাঞ্জাবিটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। কেচে না রাখলে দাগ ধরে যাবে।

অঘ্রানের শেষ মিটিং-এর তারিখ কালই পার হয়ে গেছে। আজ একবার কেলাবে যাওয়া দরকার, কিছু কমিশনের চেষ্টা দেখতে। এ ছাড়া বাইরে বের হবার কোন তাগিদ আজ আর নেই।

জীবনে কোন ঘটনার দিকে পিছু ফিরে তাকাবার অভ্যেস নেই অলীকের। আজ যা ঘটে, কাল তা ভাল ক'রে মনেও পড়ে না। ছাপ পড়ে না, দাগ লাগে না অলীকের মনে। কিন্তু আজ একটু দোমনা হয়েই কাজ করছে অলীক। কাজের মধ্যেই হঠাৎ এক একবার হেসে ফেলে। দূরান্তের একটা উলু-উলু ধ্বনি যেন মনের ভেতর ঢুকে মাঝে মাঝে হাসিয়ে দিচ্ছে অলীকের মুখটাকে। কি যেন থেকে থেকে মনে পড়ছে, এবং বেশ চেষ্টা করে ভুলে যেতে হচ্ছে।

বিকেল ফুরিয়ে যায়, সূর্য ডোবে। সন্ধ্যে নাম্‌লেও আজ আর শানাইয়ের শব্দ জাগে না কোথাও। তবু একবার ছট্‌ফট করে ওঠে অলীক। তারপরেই বেশ ভাল করে আদ্দি, ফরাসডাঙ্গা, আর মলমল্ জড়িয়ে প্রস্তুত হয়।

ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের গলিতে অন্ধকার জমে। দরজার চৌকাঠের ওপর অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অলীক। ভাব্‌তে থাকে এবং ভেবেও কিছু উপায় ঠাহর করতে পারে না। শুধু মনে হয়, আজ আর কিছুক্ষণ পরেই একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। কোথায়, কার ক্ষতি? এত তলিয়ে ভাবতে পারে না অলীক। অভ্যেস নেই।

চুপ করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় চোখ দুটোও যেন অবসাদে ঘুমন্ত হয়ে ওঠে। যেন অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক মিথ্যে একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থাকে অলীক। কালো কোট আর কর্কশ দাড়ি, সেই লোকটা আশু পোদ্দারের গলির তেতলা বাড়িটার ফটক থেকে দারোয়ানের তাড়া খেয়ে ফিরে যাবে। দেড়শো টাকার জন্য দাবি হেঁকে আবার গোলমাল বাধাবে কালো কোট। টাক-মাথা ময়লাধুতি অসহায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে।

তাহলে কি টুনি-মা'র শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হবে না? কে জানে, হয়তো দেড়শো টাকার শোকে পাগল হয়ে কালো-কোটের দল ক'নে ফেলে রেখেই চলে যাবে, আশ্চর্যের কিছু নেই।

চুলোয় যাক্। মলমলের উড়ুনিটাকে একটা কড়াপাক দিয়ে কাঁধের ওপর রাখে অলীক। কেলাবে যাবার জন্যেই বের হয়, যদিও কেলাবের চোরা-ঘরে যাবার জন্যে আজ আর এত সাদা সাজের কোন দরকার ছিল না।

—আমি তো মেয়ের বিয়েটা দিয়েই দিলুম মাত্র দুচারটা কথার প্যাঁচে, আর তুমি ব্যাটা মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারছো না? কালো-কোটটাকে দুটো কথার প্যাঁচে ঘায়েল করবার শক্তি নেই? বৃথাই মেয়ের বাপ হয়েছ। বিড়বিড় করে আপন মনেই বলতে থাকে অলীক, মনের ভেতর একটা রাগী ভোমরা যেন গুন্ গুন্ করছে।

বুদ্ধিহীন আর শক্তিহীন টাক-মাথা পাখামিস্ত্রিটার ওপর রাগ করতে গিয়ে পথের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে অলীক। তারপরেই ব্যস্তভাবে ঘরে ফিরে এসে ডাক দেয়—বউ।

নাকছাবি—কি বল্‌ছো?

অলীক—সেই ছেঁচা সোনাটার টুকরো-টাক্‌রা কিছু আছে?

নাকছাবি ভ্রুকুটি করে—সোনা?

অলীক—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই যে নাইট ডিউটির সময় একটা বড়-

লোকের ছেলে আমাকে পেরাইজ দিয়েছিল। দাম মন্দ হবে না, দেড়শো টাকার কিছু বেশিই হবে।

নাকছাবি—কপাল আমার! সে তো দশ বছর আগের কথা।

অলীক—তা হোক্ গে, আছে কি না বল?

নাকছাবি—কি মন রে বাবা? রিস্ড়ে যাবার সময় নিজেই নিয়ে গিয়ে বেচে দিলে মনে নেই?

অলীক—যাক্, তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেছে।

ঘরের ভেতরেই ছটফট করে ঘুরতে থাকে অলীক। যেন বের হবার মত শক্তি পাচ্ছে না। কিন্তু না গেলেও যে নয়। ছটা বেজে যাবার পরমুহূর্তে কালো-কোট আর কর্কশ দাড়ির পাগলামিতে একটা ভয়ংকর ঝড় উঠবে পৃথিবীতে। চন্দনের ফোঁটা-আঁকা একটা কচি মেয়ের মুখ সে ঝড় সইতে পারবে না।

সুস্থির হয়ে একবার দাড়ায় অলীক। আর, বোধহয় তার বিশ বছরের শঠ-কপট-চতুর জীবনের সব দক্ষতা ও শক্তি নিয়ে দাঁড়াবার দুঃসাহস মনে মনে আহ্বান করে। যেতে হবে, টুনি-মা'কে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থাও করে দিয়ে আসতে হবে।

নাকছাবির দিকে তাকিয়ে অলীক বলে—আজ একটা নতুন কাজে বেরুচ্ছি বউ, যদি রাত্রে না ফিরি, তবে সকালবেলায় বেলগেছে থানায় কিংবা হাসপাতালে একবার খোঁজ করিস।

আর্তনাদ ক'রে অলীকের হাত চেপে ধরতে ছুটে আসে নাকছাবি। একলাফে সরে গিয়ে দরজা পার হয়ে, এবং ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের অন্ধকার ভেদ করে চলে যায় অলীক।

ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে: আশু পোদ্দারের গলির শেষ প্রান্তে তিনতলা বাড়ির ফটকের থাম দুটো কত বড়।

একটা থামের গা ঘেঁষে টুলের ওপর দারোয়ান বসে আছে নীল রঙের উর্দি আর হল্‌দে রঙের পাগড়ি প'রে।

গিলে-করা আদ্দি আজ তার অলীকতার সব দুঃসাহস দিয়ে যেন বিমল কুটীরকে অধিকার করেছে। ফটকের সম্মুখে সিমেণ্ট-বাঁধানো ফুটপাথের অংশটুকুর ওপর আস্তে আস্তে অথচ শক্ত ক'রে পা ফেলে পাইচারি করে অলীক। অস্থির হয়ে ওঠে চোখের তারা দুটো। সময় তো হয়ে এল, কিন্তু কই, কেউ তো আসছে না।

মাঝে মাঝে পাইচারি থামিয়ে এবং এক হাতে কোঁচার প্রান্ত ধরে বিশুদ্ধ আভিজাতিক ভঙ্গিতে পথের দূরান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বিরাট বিমল কুটিরের সব স্বত্ব দখল ক'রে কত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কায়াহীন প্রেতদেহের মত কি-ভুয়া অথচ কি-ভয়ানক স্পষ্ট এক ছোট-বাবু! এই প্রেতদেহ জানে, আজ এইখানে একটি ভঙ্গির ভুল হ'লে তার খুলি-ফাটা রক্তে ফুটপাত ভিজে যাবে। হাতকড়া, হাসপাতাল, আদালত আর জেল—সবই তার চারদিক ঘিরে যেন অলক্ষ্যে ওত পেতে বসে আছে এখানে। একটু ভুল হলেই লাফ দিয়ে এসে গলা টিপে ধরবে এবং তার পরেই অলীকের একটা চলন্ত মৃতদেহের হাতে হাতকড়া দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

বিমল কুটিরের বারন্দার দেয়ালে টুং-টাং মিষ্টি শব্দে ঘড়ি বেজে ওঠে—ঠিক ছ'টা। আশু পোদ্দারের গলির মিটমিটে আলো পার হয়ে উদ্বিগ্নভাবে হেঁটে হেঁটে বিমল কুটিরের ফটকে জোরালো আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো ভিক্ষার্থীর মত বিনয়ী ও লোভী একটি মানুষের মূর্তি। সেই কালো-কোট। নিরীহ প্রার্থীর ছদ্মবেশ ধরে চলে এসেছে কি-ভয়ানক এক মহাজন!

কিন্তু দুঃসাহসিক অলীক আজ আর কোন ভয়ের ধার ধারে না। অভ্যাগত কালো-কোটের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হাসতে থাকে।—ঠিক সময় মতই এসেছেন।

কালো-কোট বলে—আপনার ওপর যথেষ্ট উপদ্রব করলাম, কিছু মনে করবেন না।

অলীক—মোটেই না। তবে আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে।

কালো-কোট—বলুন।

অলীক—আজ টাকাটা দিতে পারলুম না, কারণ সরকার মশাই আজ আসেন নি। কাল পাবেন, কিংবা পরশু, কিম্বা যে-কোন দিন এসে নিয়ে যাবেন।

কালো-কোট ক্ষুব্ধ হয়—আজ্ঞে, তাহলে কিন্তু.......।

অলীক—তাহলে কি? ক'নে ফেলে রেখে চলে যাবেন? ক'নের বাপের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবেন?

উত্তর দেয় না কালো-কোট। কর্কশ দাড়ির দৃঢ়তা দেখে অলীকও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের মত, তার বেশি নয়। কালো-কোটের দিকে তাকিয়ে অলীক প্রশ্ন করে—আপনি কি কাজ করেন?

—কাপড়ের দোকানে কাজ করি।

—খাতা লেখেন?

—আজ্ঞে না, দারোয়ানের কাজ করি।

—আমার ব্যাঙ্কে দারোয়ানের কাজ করবেন? মাইনে আশি টাকা, জল-খাওয়া বাবদ আরও পনের।

কর্কশ দাড়ির অনড় দৃঢ়তা হঠাৎ বিচলিত হয়। হাত দুটো জোড় করে বুকের কাছে তুলে নিয়ে এবং মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে কালো কোট বলে—আজ্ঞে, এত বড় অনুগ্রহ যদি সত্যিই করেন, তবে....তবে আর কি বল্‌বো......আপনার জীবন দেরঘো হোক্।

অলীক—তাহলে কথা দিচ্ছেন?

কালো-কোট—কোন্ কথা আজ্ঞে?

অলীক—কথা হচ্ছে, আসছে মাসেই আমার ব্যাঙ্কে কাজ নেবেন,

আর টাকা-পয়সার কথা তুলে কখ্খনো মেয়ের বাপের সঙ্গে কোন রকম তক্কাতক্কি করবেন না।

কালো-কোট—আপনি স্বয়ং যখন এর মধ্যে রয়েছেন, তখন আমার আর তক্কো করার কোন দরকারই নেই হুজুর।

অলীক—যান, এবার বেশ আনন্দ ক'রে বর-ক'নে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যান। আর সাবধান, মেয়ের বাপের কাছে টাকার কথা একেবারেই তুলবেন না।

দু'হাত জোড় ক'রে এবং কোমর ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে কালো-কোট বলে—যে আজ্ঞে।

চলে গেল কালো-কোট। অলীকতার এমন একটা অগ্নি-পরীক্ষাও স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেল গিলে-করা আদ্দি। বিমল কুটিরের ফটক পেছনে রেখে, আশু পোদ্দারের গলির শেষ ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে হেসে ফেলে অলীক। ফুটপাত ধরে সোজা চল্‌তে থাকে। আজ আর কোন কাজ নেই। অগ্রাণের এই সন্ধ্যাটা শুধু এইভাবে মনের খুশীতে চলে চলে এবং হেসে হেসেই শেষ করে দিতে হবে।

কোন লক্ষ্য নেই, গন্তব্যও নেই। ফিরে আবার একই ফুটপাত ধরে উল্‌টো মুখে চল্‌তে থাকে অলীক। আশু পোদ্দারের গলির মুখে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর আবার বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যায়।

ঘুরে ফিরে আবার আশু পোদ্দারের গলির মুখ। ল্যাম্প-পোস্ট মিটি-মিটি জ্বলে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অলীক। সাতটা তো প্রায় বাজে।

অলীকের প্রাণটা যেন একটা বাঘিনীর আত্মা; যেন অনেক অন্বেষণের পর এই গলির ভেতর তার হারানো শাবকের কচি গায়ের গন্ধ আবিষ্কার করেছে। তাই ঘুরে ফিরে এখানেই এসে দাঁড়াচ্ছে।

গলির পথে আলো-অন্ধকারে মেশামেশি রহস্যের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে অলীক। টুনি-মা কি শ্বশুরবাড়ি চলেই গেল ?

শানাই বাজে না, আজ বিয়ের তারিখও নয়, আজ শুধু পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে বিদায়ের পালা। এ-পালা দেখতে কেমন ? দুরন্ত একটা লোভে আকুল হয়ে জ্বল জ্বল করে অলীকের চোখ।

বিয়ে-বাড়ির আদর আর অভ্যর্থনা চুরি করতে আনন্দ আছে, তার জন্য যথেষ্ট লোভও আছে অলীকের। কিন্তু আজ যেন অলীকের দেহ আর মনের ভেতর লোভের নাড়ীগুলি বদলে গেছে নতুন হয়ে। লোভ হয়, একটা মেয়ে-বিদায়ের কান্না চুরি করতে। পৃথিবীর মেয়ের বাপ-গুলির বিষণ্ণ মুখ আর বেদনার্ত চোখগুলিকে নকল করতে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময়, একটি চন্দনের ফোঁটা-আঁকা কচি মুখের দিকে তাকিয়ে শখের চোখের-জল ফেলতে।

লোভ সামলাতে পারলো না গিলে-করা আদ্দি। জীবনের সব ঘটনা থেকে চিরকাল পালিয়ে এসেছে যে বিশ বছরের অলীক, সে-ই গতকালের একটা পুরানো ঘটনার কাছে একটা নতুন লোভের আবেগে দেখা দিতে ফিরে যায়। জীবনে এই প্রথম। গলির ভেতর তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে অলীক।

হ্যাঁ, টুনি-মা বিদায় নিচ্ছে। টোপর মাথায় বর রয়েছে দাঁড়িয়ে তার পাশে। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে আছে। বউয়ের দল মাথার কাপড় টেনে টেনে চোখ ঘষছে। কালো কোটের ওপর গরদের চাদর জড়িয়ে বরের বাপ দাঁড়িয়ে আছে একটা পুঁটলি হাতে, বরপক্ষের আরও দু-চারজন দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার কিছু লোকও এসে ভিড় করেছে। টাক-মাথা ঠিক টুনি-মার পেছনে দাঁড়িয়ে বার বার চোখ মুছ্‌ছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে অলীক। আরও এগিয়ে যায় এবং টুনি-মার খুব কাছে এসেই দাঁড়ায়।

ঘোমটা আছে, তবু টুনি-মার মুখটা স্পষ্ট করেই দেখতে পায় অলীক। কি সুন্দর, কত কচি, একটা চন্দনের ফোঁটা-আঁকা মুখ রে। অলীকের ছু' চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জল গড়াতে থাকে।

কালো-কোট পুঁটলি হাতে নিয়ে অলীকের সামনে এসে কোমর ঝুঁকিয়ে দাঁড়ায় এবং সসম্ভ্রমে ছু-হাত তুলে নমস্কার জানায়।-- আমরা আসি তাহলে ছোটবাবু, অধীনকে মনে রাখবেন।

জোরে হাত ঘষা দিয়ে চোখটা একবার মুছে নিয়ে টাক-মাথা বিস্মিত-ভাবে প্রশ্ন করে—কে ছোটবাবু? কোন্ ছোটবাবু?

কালো-কোট বিরক্তভাবে বলে—আপনার পিতিবেশী, বমল কুটীরের ছোটবাবু।

টাক-মাথা বিমূঢ়ের মত চারদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

কালো-কোট—আপনার সুমুখে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি, দেখতে পাচ্ছেন না? মেয়ের জন্যে এত কী কাঁদলেন যে চোখ অন্ধ হলো মশাই?

টাক-মাথা—ইনি তো আপনার জ্ঞাতিভাই।

কালো-কোট ভ্রূকুটি করে—তার মানে?

টাক-মাথা—তার মানে, আপনার ছেলের কাকা।

বরপক্ষের একটা মজবুত চেহারার লোক এক লাফে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেসা করে—কে ছেলের কাকা?

গিলে-করা আদ্দির দিকে আঙুল তুলে টাক-মাথা বলে—উনি।

পাড়ার লোকের জমাট ভিড়টাও হঠাৎ টলমল করে ওঠে এবং মুহূর্তের মধ্যেই উগ্র হয়ে যেন ঘটনাটাকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায়। হল্লা তুলে জিজ্ঞাসা করে—কোন্ লোকটা? কোন্ লোকটা?

অলীকের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে কালো-কোট প্রশ্ন করে—আপনি কে মশাই।

পাড়ার লোক চেঁচামেচি করে বলতে থাকে—বিমল কুটীরের ছোটবাবুকে কে না চেনে? কিন্তু এ ব্যাটা কে মশাই?

বরপক্ষের লোকেরা বলে—ছেলের কোন কাকাই বরযাত্রী হয়ে আসেনি। ছেলের কাকাদেরও কে না চেনে? কিন্তু এ শালা কে?

—এ শালা একটা অলীক! পাড়ার লোকের মধ্যে একজন চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন গর্জন করে—দে ফাটিয়ে।

স্তম্ভের মত স্থির ও নির্বাক গিলে-করা আদ্দির পেছন থেকে একটা জুতোর বাড়ি হিংস্র হয়ে আছড়ে পড়ে ঠিক তার বাঁ চোখের ওপর। মলমলের উড়ুনি দিয়ে চোখ চেপে ধরে অলীক। পরমূহূর্তে জনতার কঠিন ব্যূহটাকে যেন একটা শৃঙ্গী জানোয়ারের মত ঢুঁ মেরে ভেদ ক'রে আর মুক্ত হয়ে দৌড় দেয়।

তাড়া করেও ধরা গেল না। আশু পোদ্দারের গলির আলো আর অন্ধকার থেকে যেন নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অলীক।

ভৈরবতলা সেকেণ্ড লেনের ধূলোতে অঘ্রানের সকালে চারদিকের ঝিঞ্জির এক ফাঁকে কয়েক মুঠো মিষ্টি রোদ এসে লুটিয়ে পড়ে। উল্টোডিঙ্গির খালের কুয়াশা উবে যেতে থাকে। একখণ্ড কাঠের তক্তার ওপর আছাড় দিয়ে কাপড় কাচে অলীক।

বাঁ দিকের ভুরুর ওপর ক্ষতের দাগ পড়েছে, হাত দিয়ে ছুঁলেই বোঝা যায়। আর চোখে দেখা যায়, দাগ পড়েছে সাদা মলমলের উড়ুনিতেও, চোখ ফাটা রক্তের ফোঁটা-ফোঁটা লাল-লাল দাগ।

হেসে ফেলে অলীক। সাবান-জলে উড়ুনিটাকে একবার চুবিয়ে নিয়ে তারপর জোরে আছাড় দিয়ে কাচতে থাকে।

ভেজা লালপেড়ে শাড়ি প'রে টিকালো নাকে নাকছাবি এসে বলে—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি।

নাকছাবির হাতে একটা মাটির সরার ওপর কয়েক মুঠো চাল, এক ঢেলা গুড়, আর কয়েকটা বেলপাতা। অলীক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছিস্ বউ?

—ভৈরবতলায় পূজো দিতে।

—কিসের পূজো?

—মানত করেছিলাম।

—কিসের মানত?

—তা শুনে তোমার লাভ কি?

—বলই না, শুনলে ক্ষেতি তো আর হবে না?

—কাল ভরা সন্ধ্যেটার সময় একটা ডাকাতের মত মুখ ক'রে, আর কি বল্‌তে বল্‌তে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেলে, মনে নেই?

—মনে পড়েছে। তাতে তোর মানত করবার কি দরকারটা হলো?

—মানত করেছিলাম, ঠাকুর যেন তোমার সব আপদ কেটে দিয়ে রাতের মধ্যেই তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে দেয়।

কাপড়-কাচা থামিয়ে হো-হো করে হাসতে থাকে অলীক।—বাবা ভৈরব এতদিনে তোর একটা কথা রেখেছে, তাই না?

—রেখেছেন বৈকি?

নাকছাবি তার পূজোর পসরা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। অলীক ডাকে—শুনছিস বউ?

দাঁড়ায়, ফিরে তাকায় নাকছাবি। অলীক হেসে হেসে বলে—আজ কোন মানত করবি না?

—বল, কি মানত করবো?

—সেই মানতটা আর-একবার কর্ না?

কোন্ মানত, মনে পড়ে না নাকছাবির। সারা জীবন ধ'রে কত ঠাকুরের কাছে কত মানতই তো করেছে। আজ আবার নতুন ক'রে কোন্ পুরনো মানতের কথা তুলছে মানুষটা। নাকছাবি জানতে চায়—কোন্ মানতটা ?

টিকালো নাকে নাকছাবির মুখের দিকে একটা বিহ্বল দৃষ্টি তুলে অলীক বলে—তোর কোলে একটা আসুক্।

চম্‌কে ওঠে নাকছাবি। তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। আজ এতদিন পরে সে-মানতের কথা আবার তোলে কেন এই সন্ন্যেসীর মত মানুষটা ? কি লজ্জা ! নাকছাবির শীর্ণ ও সাদা ঠোঁট দুটোও মুহূর্তের মত লাল্‌চে হয়ে ওঠে, অদ্ভুত একটা হাসির ছোঁয়া লেগে।

নাকছাবি ব্যস্তভাবে বলে—আমি চললাম।

অলীক—থাম্ থাম্, কথাটা ভাল ক'রে না শুনে নিয়ে যাস্‌নি।

নাকছাবি—শুনলাম তো।

অলীক—আর একটু শুনে নে।

নাকছাবি—বল।

অলীক—কিন্তু ঠিক করেছিস কিছু, কি চাইবি ? ছেলে না মেয়ে ?

নাকছাবি—তুমি যা বল্‌বে।

অলীক—মেয়ে চাই।

নিষ্পলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে অলীক। ঠাণ্ডা ও সাদা হৃৎপিণ্ডটা যেন কোন্ এক উত্তাপের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে আছে।

নাকছাবি বলে—বেশ তো, তাই হবে।

আর দেরি করে না নাকছাবি। দরজা পার হয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়। অলীকও তার নিষ্পলক দৃষ্টিটাকে আবার ঘুরিয়ে নেয়, দু-হাত চালিয়ে কাপড় কাচতে থাকে।

আর একবার সাবান-জলে চুবিয়ে নিয়ে সাদা মলমলের উড়ুনিকে তক্তার ওপর আছাড় দিতে থাকে অলীক। উড়ুনির সাদার ওপর লাল-লাল দাগগুলি ফিকে হয়ে আসছে, যেন মিলিয়ে যাচ্ছে কতগুলি কোঁটা-কোঁটা চন্দনের দাগ।

নীলের জলে চুবিয়ে নিয়ে উড়ুনিটাকে আস্তে আস্তে একবার মেলে ধরে অলীক। চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে, দাগগুলি কি সত্যিই ঝাপসা হয়ে এল, না চোখ দু'টোই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে?

বর্ণচোরা

মাত্র ছ'বছর বয়স ছেলেটার, কিন্তু মুখের চেহারাটা এর মধ্যেই ঝামিয়ে গেছে। খুব রোগা। মাথার চুলগুলি পাত্‌লা এবং ফাঁকা ফাঁকা। বয়স্ক মানুষের একটা ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরানো। ছোট শরীরে অপরিমিত ধুতির ভার অনেক চেষ্টা করে গুঁজে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। হারাণ মাস্টারের পেছু পেছু পোষা কুকুরছানার মত গোকুল সিঁড়ি বেয়ে জগৎবাবুদের কলকাতার বাড়ির দোতলায় এসে উঠলো।

দেশ থেকে ফিরছে হারাণমাস্টার। হারাণ জগৎবাবুর ছেলেপিলেদের পড়ায় আর নিজে কলেজে পড়ে।

বাড়ির সবাই চোখভরা কৌতূহল নিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো হারাণ-মাস্টার ও গোকুলকে। হারাণ-মাস্টার প্রায় বিশ মিনিট ধরে এই বাংলা দেশেরই একটা গ্রামের ইতিহাস বর্ণনা ক'রে শোনালো, যার মর্মার্থ হলো, এই গোকুল না-কি সম্পর্কে জগৎবাবুর ভাইপো-গোছের কেউ হয়।

জগৎবাবুর সংশয় ঘুচলো না। গোকুলকে দু'চার বার প্রখর দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা ক'রে মাথা নাড়লেন—"উঁহু, ফটিকের ছেলে? কোন্ ফটিক?"

হারাণ।—আপনার জেঠামশায়, মেজচৌধুরী নিত্যবাবুর ছেলে ফটিক?

জগৎবাবু।—কোন্ নিত্যবাবু? কোন্ জেঠা?

হারাণ।—সেই যে সেটেলমেণ্টে কাজ করতেন, আপনাদেরই

খালপারের সরিক। নিত্যবাবুর ভাই সেই যে চৈতন্যবাবু, ইয়া পালোয়ানের মত চেহারা, ফৌজদারী মামলা ক'রে ফতুর হলো। শেষে মরলো যক্ষায়।

জগৎবাবু।—ওসব কুলজী রাখ মাস্টার। বল ছেলেটি কে?

হারাণ।—আপনি কি শোনেন নি, বিয়ের ক'মাস পরেই ফটিকদা পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার পর চারমাসের মধ্যেই মারা যায়। গোকুলকে চোখে দেখে যায় নি।

জগৎবাবু।—হুঁ, তাতে হলো কি?

হারাণ।—ফটিকদার বউ আঁতুড় থেকে বেরিয়ে মাত্র দেড়মাস বেঁচে ছিল। গোকুল এতদিন ছিল ফটিকদার শাশুড়ির কাছে। এবার বুড়ীও পটল তুলেছে।

জগৎবাবু।—বুঝলাম। তুমি যক্ষা পাগলামি আর খুন-ডাকাতির একটি চারা ঝাড় থেকে তুলে নিয়ে এসেছ।

জগৎবাবুর স্ত্রী নন্দা এতক্ষণে কথা বললেন।—এরকম কপাল নিয়েও মানুষ সংসারে জন্ম নেয়! বাপকে খেলে, মাকে খেলে। যেখানে যায় পিদিম নিবে যায়। ওর ঠাঁই হবে কোথায়?

হারাণ।—আমিও তাই বলছিলাম কাকিমা। দেখুন না, ভুগে ভুগে এই বয়সেই চেহারাটা কেমন···!

নন্দা।—চামচিকের মত।

জগৎবাবু।—বিড়িটিড়ি খায় বোধ হয়।

হারাণ-মাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হঠাৎ গোকুলের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এ কি রে গোকু! এখনো চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছিস? জেঠামশাইকে প্রণাম কর, আর ঐ যে জেঠিমাও রয়েছেন।

গোকুল এতক্ষণ কাঠগড়ায় আসামীর মত দাঁড়িয়ে যেন দুই পক্ষের কৌঁসুলীর তর্ক শুনছিল। কি বুঝেছে তা সে-ই জানে। হারাণের

আকস্মিক নির্দেশে গোকু চম্‌কে উঠলো শুধু, কিন্তু আচরণে কোন উৎসাহ বা সাড়া দেখা দিল না। হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি চুপ করে রইল।

জগৎবাবু, নন্দা, হারাণ মাস্টার, সবাই চুপ করে ছিল, থিয়েটারে সীন বদ্‌লাবার আগে যেমন লোকে কিছুক্ষণ উৎসুকভাবে নীরব হয়ে থাকে। তার পরেই জগৎবাবুর গলা ঘড় ঘড় করে উঠলো,—হুঁঃ, প্রণাম করবে! ওকে বল এখনি রাস্তায় গিয়ে লোকের পকেট মেরে আনতে, দেখবে ওর উৎসাহ।

হারাণ।—আজ্ঞে হ্যাঁ, যেসব সাংঘাতিক মানুষের মধ্যে এতদিন ছিল, ওরকম হওয়া আশ্চর্য নয়। তবে কোনো মহৎ লোকের দয়া ও আশ্রয় পেলে মতিগতি ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চয় মানুষ হবে।

জগৎবাবু।—কিস্‌সু হবে না।

হারাণ মাস্টার আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে, অক্ষম অসহায় ও উপায়হীনের মত, তারপরেই হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে। স্টীমারে একজন সাধু গোকুর হাত দেখে বেশ ভাল ভাল কথা বললো। ওর অদৃষ্টে নাকি এবার অন্নদাতা-যোগ আছে, আর অন্নদাতার না কি খুব সৌভাগ্য-যোগ আছে।

জগৎবাবু ও নন্দা সহসা বলবার মত কোন কথা খুঁজে পেলেন না। তাঁদের বিরূপ ও বিরুদ্ধ মনের আপত্তিগুলিকে হারাণ মাস্টার যেন এলোমেলো ক'রে দিয়েছে; হারাণও এইবার সময় বুঝে তাক করে তার আসল বক্তব্য বলে ফেললো—আপনাদের কাছে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। যেমন ইচ্ছে রাখুন।

জগৎবাবু।—আরে না না না। নিজেই হাফ-এ ডজন নিয়ে বিব্রত। শুধু দুটো খেতে পরতে দেওয়ার প্রশ্ন নয়, মানুষ করার দায়িত্ব। কে জানে, শেষে মানুষ হবে, না বনমানুষ হবে? তুমি ওকে অন্যত্র ব্যবস্থা করে দাও।

হারাণ।—বেশ তো, এখন ছুটো দিন এখানে জিরিয়ে নিক্, তারপর নিশ্চয়…।

গোকুল থেকে গেছে, আজ দশ দিন হলো। নন্দা রাগে প্রায় আত্মহারা হয়ে ঝড়ের মত জগৎবাবুর কাছে এসে ভেঙ্গে পড়লেন।—দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা হচ্ছে।

জগৎবাবু—লক্ষণ দেখা দিয়েছে না কি?

নন্দা—দিয়েছে। মৃগেনবাবুর মেয়েরা বাড়ি চড়ে এসে শুনিয়ে দিয়ে গেছে, গোকুকে নাকি আমরা কশাইয়ের মত কষ্ট দিচ্ছি। পেট ভরে খেতে দিই না, শীতে জামা দিই নি, বিছানা দিই নি…।

জগৎবাবু—কেন তারা এ সব বললে?

নন্দা—গোকু ছোঁড়া গিয়ে লাগিয়েছে নিশ্চয়।

জগৎবাবু—নিশ্চয় নয়। মৃগেনবাবুর মেয়েরা স্বচক্ষে কোন প্রমাণ দেখেছে, তাই বলেছে।

নন্দা রাগের মাত্রা রাখতে পারলেন না—তুমি বেশী ভালমানুষী ফলিও না।

জগৎবাবু—আমি যেটা জানতে চাইছি, সেই কথাটা স্পষ্ট করে বলো। জামা বিছানা দেওয়া হয়েছে কি না?

নন্দা—সবই দেব ঠিক করেছিলাম। আজই দিতাম।

জগৎবাবু—কিন্তু দিয়ে উঠতে পারনি, এই তো? ওর খাওয়া-টাওয়ার ব্যাপারেও এই রকম কিছু হচ্ছে নিশ্চয়।

নন্দা—শুধু কাল রাত্রে মাছ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।…কিন্তু এইটুকু ছেলের হিসেবটা দেখলে? আজ ওকে আমি খুন্তি-পেটা করবো।

জগৎবাবু নন্দাকে সতর্ক করেন—কিন্তু তোমার এ রকম ব্যবহার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।

নন্দা সবেগে ঘর থেকে বের হয়ে যান। বোঁচার গা থেকে সোয়েটারটা রূঢ়ভাবে খুলে নিয়ে আসেন। জগৎবাবুর সামনে জামাটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—এই নাও।

বাড়ির আবহাওয়া গোকুর উপদ্রবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। হাঁপানী রুগীর মত দম টেনে টেনে চেঁচিয়ে কথা বলে গোকু। যত সব গেঁয়ো বুলি। দাবী, বায়না, আবদার ক্রমে ক্রমে চড়েই উঠছে। বকুনি দিলে বা দু'এক ঘা চড়-চাপড় দিলে তো রক্ষা নেই, কদর্য কান্না আর চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ করে তোলে। এবার আবদার ধরেছে—বই চাই। রাখু মীনু বোঁচা বই পড়ে, আমারও চাই।

হারাণ-মাস্টার কান ম'লে পড়ার ঘর থেকে গোকুকে তাড়িয়ে দিল। গোকু রুখে এসে গড়িয়ে পড়লো রান্নাঘরে, নন্দার কাছে। তরকারীর খোসাগুলির ওপর শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কান্না ধরলো। জলের গামলাটা উল্টে গেল। রাঁধুনে ঠাকুর চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গোকুকে চিলকোঠায় বন্ধ করে রাখলো।

নন্দা এবার নিঃসন্দেহ হয়েছেন, এ ছেলে বড় হয়ে বিভীষণ হবে। হবে না কেন? যে ছেলে এই বয়স থেকেই শিখেছে শুধু কি করে নিজেরটা বাগাতে হয়, সে তো ঘর-জ্বালানো ভাই-খেদানো বিভীষণ হবেই।

নন্দার অনুমান মিথ্যে হলো না। একে একে সব আদায় করেছে গোকু, ভিন্ন বিছানা পায়, গরম সোয়েটার পায়। সংগ্রামে আজ পর্যন্ত গোকুর পরাজয়-লাভ ঘটে নি এবং জয়ের তালিকা ক্রমশ ভরে উঠছে। একখানা বর্ণপরিচয় ও একখানা ধারাপাত পেয়েছে, চীনে মাটির সিংহ পেয়েছে এক জোড়া।

সব চেয়ে আশঙ্কার কথা, গোকু বিশেষ করে তিন জনের শত্রু হয়ে

দাঁড়িয়েছে—রাখু, মীনু ও বোঁচার। রাখুরা কখন কি খেল, কোথায় গেল, কেন হাসলো—গোকুর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন সজাগ হয়ে সব সময় পাহারা দিচ্ছে। কিছুই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। গোকু যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পায়, রাখু মীনু বোঁচা তেতালার ঘরে কপাট বন্ধ করে রেডিওর চাবি টানছে। অমনি গোকু ঘুম ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, আর ছুটে গিয়ে মরিয়া হয়ে তেতালার ঘরের কপাটে লাথি মারে।

কাণ্ড দেখে নন্দা ভয় পাচ্ছেন সব চেয়ে বেশী। এবং জগৎবাবু যেন বুঝেও কিছু বুঝছেন না। গোকুর এই প্রতিযোগিতার পরিণাম শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বে কে জানে!

গোকুর কিন্তু একটা নিঃস্বার্থ সত্তা আছে। শুধু এক জনের সম্পর্কে গোকুর কোন বৈরিভাব, কোন স্বার্থবাদ এবং কোন প্রতিযোগিতা নেই। সে হলো, লালু—নন্দার কোলের ছেলেটি। গোকু যখন লালুকে আদর করে তখন সে আদরের যেন সীমা থাকে না। লালুর পেটে নিজের মাথাটা ঘষে ঘষে গোকু হাসতে থাকে, লালুর ছোট ছোট পা দুটো মুখে পুরে দিয়ে গোকু নিজেই খুশীতে লাফাতে থাকে। লালুর হাতের কাছে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বার বার অনুরোধ করে—আমার চুল ছেঁড় লালু, একটু খিমচে দাও, লালু।

নন্দা হেসে ফেলেন—ও কি করছিস গোকু, অত বেশী হাসাসনি লালুকে।

আনমনা হয়ে নন্দা কিছুক্ষণ গোকুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর চোখের ওপর কিছুক্ষণের জন্য যেন বহুদূরের আকাশকোলের মেঘের মত এক টুকরো জলভরা মেঘের ছায়া পড়ে। তেমনি আনমনেই শান্ত-কোমল-স্বরে গোকুকে বলেন—যাও গোকু, ঝিকে বলো তেল মাখিয়ে তোমায় স্নান করিয়ে দেবে। আর দেরী করো না।

যেন অন্য কোন মানুষ এই কথাগুলি বল্‌ছে আর নন্দা কান পেতে

শুনছেন। এবং শুনতে পেয়েই যেন একটু সতর্ক হয়ে ওঠেন। গোকুর মুখের দিকে আর না তাকিয়ে ত্রস্তভাবে লালুকে কোলে তুলে নেন, এবং লালুকে আদর করতে করতে ঘরের চারদিকে ঘুরতে থাকেন। খোঁজ করেন, লালুর নতুন মোজা জোড়া কোথায় গেল?

কিন্তু 'আবার পর পর কতগুলি তিক্ত ঘটনার বিস্বাদে বাড়ীর মন বিষিয়ে উঠলো। গোকু ছাদের কার্নিসের ওপর দিয়ে হাঁটছিল, ঠাকুরটা খারাপ ভাষায় গোকুকে গাল দিয়েছে। জগৎবাবু ঠাকুরকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলেন। নন্দাকে হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হলো।

আবার একদিন, সামান্য একটা ছবি নিয়ে গোকু একাই রাখু মীনু বোঁচার সঙ্গে নিদারুণ মারামারি করলো। জাঁতি ছুঁড়ে মেরেছিল গোকু, মীনুর কপালটা কেটে গেছে, আর ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

এ বাড়ীতে গোকুর থাকা আর চলতে পারে কি?

নন্দা বললেন—না আর কোন মতেই গোকুকে এ বাড়িতে রাখা চলে না। জগৎবাবুও বললেন—রাখা উচিত নয়।

হারাণ মাস্টার সব অভিযোগ শুনে নিয়ে সব চেয়ে বেশি রাগ করে চিৎকার করতে থাকে—ঠিক বলেছেন কাকিমা, তবে আমার মতে ছোঁড়াকে আরও কিছুদিন রেখে বেশ একটু টিট্ না ক'রে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

জগৎবাবু—তার মানে?

হারাণ—শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে ওর কোন শিক্ষাই হবে না। আমি বলি, স্টুপিডটা দু'বেলা ঝিয়ের সঙ্গে বাসন মাজবে, এই নিয়ম করে দেওয়া হোক্।

নন্দা ভ্রূকুটি ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং জগৎবাবু কিরকম একটা হাই তুলে যেন একটু বিরক্ত হয়েই গম্ভীরভাবে বলেন —তুমি সমস্যাটা বুঝতে পারছো না, হারাণ।

—বাস্তবিক আমি বুঝতে পারছি না কাকাবাবু। ছোঁড়া কোথায় আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ হবে, না উল্‌টো…

জগৎবাবু—বাজে কথা বলো না, হারাণ। ছ' বছর বয়সের একটা বাচ্চা, কৃতজ্ঞতার বোঝে কি?

—আপনাদের দয়া-মায়া তো বুঝতে পারে?

জগৎবাবু—দয়ামায়া করলে বুঝতো ঠিকই, কিন্তু ··কিন্তু যেসব কাণ্ড হচ্ছে তা'তে…।

নন্দার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে জগৎবাবু আবার মুখ ঘুরিয়ে চিন্তিতভাবে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নন্দা তীব্র-স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—কি কাণ্ড হচ্ছে? মিছিমিছি আমার ওপর দোষ চাপিও না বলে দিচ্ছি।

জগৎবাবু কি-যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বললেন না, এবং ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

হারাণ মাস্টার নন্দাকে শান্ত করে—কিছু মনে করবেন না কাকিমা, কাকাবাবুর কথার কোন অর্থ হয় না।

—খুব হয়, হারাণ। উনি বল্‌তে চাইছেন, গোকুর ওপর আমার বিদ্বেষ আছে। আমি গোকুকে কষ্ট দিচ্ছি নিষ্ঠুরের মত। চার ছেলেমেয়ের মা হয়েও আমার মনটা নাকি…।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন নন্দা, তারপর যেন প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গীতে মনের সব জোর দিয়ে বলেন—পরের ছেলেকে আপন করতে পারবো না, পরের ছেলে ঘ'রেও রাখতে পারবো না। আমার দ্বারা এসব হবে না।

হারাণ মাস্টারের মুখ বিষণ্ন হয়ে ওঠে, হতাশ ও নিরুপায়ের মত।

নন্দাই আবার, যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় ক'রে বলতে থাকেন—এক রত্তি ছেলে, কিন্তু কত হিংসুটে বুদ্ধি পেটে পেটে! কত রকম তার আবদার।

হারাণ মাস্টার—খাবার-টাবার নিয়ে রাখু-মীনুদের সঙ্গে খুব হিংসেহিংসি করছে বুঝি ?

নন্দা—না না, ওসব কিছু নয়। সবাই যা খায়, গোকুও তাই খায়। খাবার নিয়ে হিংসেহিংসি করবে কেন ?

হারাণ—জামা কাপড় নিয়ে ?

নন্দা—না, এখন ওর জামা কাপড় তো রাখুর চেয়ে বেশী।

হারাণ—তবে ?

নন্দা কোন উত্তর দেন না, অন্যমনস্কের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ছ'বছর বয়সের একটা একরত্তি বাইরের ছেলে ঘরের ভেতর ঢুকে কিসের দাবী ক'রে ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করেছে, মুখ খুলে বল্‌তেও যেন ভয় করছে নন্দার। অথচ ভয়টাকে উপেক্ষা করারও শক্তি পাচ্ছেন না।

মিথ্যে নয়, বড় বেশী দাবী করছে গোকু। কালকেই তো সারা দুপুরটা নন্দার আঁচল ধরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, ধমক দিলেও ছাড়েনি। জেদ ধরেছে গোকু, বোঁচার যেমন জন্মদিন হলো, তেমনি ওর জন্মদিনও করতে হবে। গোকুও চন্দনের টিপ পরবে, আর নন্দার কোলে বসে পায়েস খাবে।

হঠাৎ আতঙ্কিতের মত নন্দা বলে ওঠেন—না, আর এসব বাড়তে না দেওয়াই ভাল, হারাণ। তুমি একটা ব্যবস্থা করে ফেল।

হারাণ আরও শঙ্কিত হয়ে বলে—কিসের ব্যবস্থা, কাকিমা ?

নন্দা—গোকুর ব্যবস্থা।

হারাণ—গোকুকে কি এখানে রাখতে আর চান না ?

নন্দা আনমনার মত তাকিয়ে চুপ ক'রে থাকেন।

হারাণ মাস্টার বলে—আচ্ছা তাই হবে।

ঘর ছেড়ে চলে গেল হারাণ মাস্টার।

হারাণ-মাস্টার খবর নিয়ে এল।—রাজচন্দ্র অনাথ আশ্রমেই ব্যবস্থা করা হলো।

জগৎবাবু কথাটা শুনেও খবরের কাগজের ওপরেই মাথাটা ঝুঁকিয়ে রাখলেন। নন্দার বুকটা আচমকা ছুর্ ছুর্ করে উঠলো।

অনেকক্ষণ পরে জগৎবাবু বললেন—একটা দিন ঠিক করে ফেল। কিন্তু দেখ, ও যেন জানতে না পারে কিছু। বেড়াবার নাম করে নিয়ে যেও, পরে একবার গিয়ে কাপড়-চোপড় বিছানা দিয়ে এস।

মাত্র আর কটা দিন বাকি। এরই মধ্যে একদিন গোকুর জন্যে একখানা আলোয়ান কিনে নিয়ে এলেন জগৎবাবু। রাখু, মীনু ও বোঁচাকে নন্দা একদিন বেদম মার দিলেন—খরবদার যদি গোকুর সঙ্গে তোমাদের ঝগড়া করতে দেখি !

দিন এগিয়ে আসছে। গোকু একেবারে শান্ত।

হারাণকে সেদিন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন নন্দা—ও কিছু টের পেল নাকি, হারাণ ?

হারাণ—কি করে পাবে ?

নন্দা—কিন্তু দেখছি তো, আজকাল সব সময় আমার পেছু পেছু ঘুরছে। খেলতে বললে বই .নিয়ে বসে। নিজেই সময় মত স্নান করছে। বোঁচা পাজিটা ওর একটা খেলনা ভেঙে দিল, কিন্তু একটা কথাও বললে না গোকু, আশ্চর্য।

হারাণ—নতুন আলোয়ান দেখে কিছু মনে করে নি তো ?

নন্দা—কে জানে কি মনে করেছে! কিন্তু আমার সত্যি ভয় করছে, হারাণ। এতটুকু একটা বাচ্চা, এখানে মন বসে গেছে। ওকে সরিয়ে দিচ্ছি জানতে পারলে সত্যিই কি আর যেতে চাইবে ?

হারাণ—না না, ওসব কিছু নয় কাকিমা। কিস্স্যু টের পাবে না। এক ভাঁওতায় বের করে নিয়ে চলে যাব।

আরও কটা দিন গেল, তারপর সে দিনের সেই সকাল বেলাটা বেশ ঝকঝকে সূর্য উঠেছে। বাড়ীতে কোলাহল নেই। বেশ মিষ্টি মিষ্টি দিন। তারই মধ্যে হারাণ-মাস্টারের গলার স্বর কর্কশ উল্লাসে বেজে উঠলো—ওরে গোকু, আজ আমি আর তুই চিঁড়িয়াখানা দেখতে যাব।

জগৎবাবু খবরের কাগজ রেখে উঠে পড়লেন। নন্দাকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে জানালেন—আমি এখনি চললাম, অনেকগুলি জরুরি কাজ আছে। ফিরতে হয় তো বিকেল হয়ে যাবে।

নন্দার কোনো আপত্তি শোনবার আগেই জগৎবাবু চাদর কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেলেন। নন্দা যেন হিংস্র এক দুর্যোগের মুখে একা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওপরতলা থেকে মিছামিছি নীচের তলায় একবার নামলেন নন্দা। আবার উঠলেন। যেন ছটফট ক'রে ছুটোছুটি করছেন নন্দা। একটা ভয়, একটা দমবন্ধ বেদনা যেন আজ সারাদিন তাঁর সমস্ত চিন্তায় গা ছুঁয়ে রয়েছে, সরানো যাচ্ছে না। গোকু আজ সকালেই ঘুম থেকে উঠে বলেছে—আমি আজ থেকে রাত্রে তোমার কাছে শোব বড় মা, বড্ডো ভূতের ভয় করে।

নন্দা একবার ভাবলেন—এখনি সেজমামার বাসায় চলে যাই। সন্ধ্যের পর ফিরে আসা যাবে।

হারাণ এসে নন্দার কাছে হেসে হেসে বলে—তৈরী থাকুন কাকিমা, দুপুরে এসেই গোকুকে নিয়ে যাব।

নন্দার গলা কাঁপতে থাকে—ছেলেটা সব বুঝে ফেলেছে, হারাণ। সারাটা সকাল আনাচে-কানাচে লুকিয়ে ফিরছে। ও যেতে চাইবে না।

হারাণ—না কাকিমা, বৃথা আশঙ্কা করছেন।

নন্দা—একেবারে এইটুকু একটা বাচ্চা, আপন-পর জ্ঞান নেই। এটা পরের বাড়ী বলে যদি বুঝতো তবে কোনো ভাবনা ছিল না।

ঠিক সন্ধিক্ষণ বুঝেই যেন গোকু তার দাবীকে আরও প্রচণ্ড ক'রে

তুলেছে তাই নন্দার পক্ষে এভাবে না পালিয়ে থেকে উপায় নেই।
বড় মা! বড় মা! ওপরতলা থেকে নীচেরতলা নেমে নন্দাকে সন্ধান করছে গোকুর কণ্ঠস্বর। ডাক শুনলেই নন্দা এঘর থেকে ওঘরে সরে সরে পড়েন। গোকু যেন আজ চরম জানা জেনে নিতে চায়—আজ রাত থেকে ভূতের ভয়ে নন্দার গা ঘেঁষে শোবার অধিকার তার আছে কি না।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ আর জেদ নাই, উৎপাত উপদ্রবের কোন লক্ষণ নেই গোকুর কথায় কিংবা আচরণে। অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করার পর যখন একবার নন্দাকে মুখোমুখি দেখে ফেলে, তখনই শুধু ব্যস্তভাবে নন্দার সাম্‌নে এগিয়ে আসে, আর এই সাংঘাতিক বায়নাটাকে অতি কোমল ও দুর্বল নাকিস্সুরে যেন আবৃত্তি করে গোকু।

উত্তর দেন না নন্দা, এবং গোকুর মুখের দিকে না তাকিয়ে ব্যস্তভাবে অন্য কোন কাজের উদ্দেশে অন্য দিকে চলে যান। যেন গোকু আবার এসে ধরতে না পারে, একেবারে ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে ঢুকে এবং জানালা বন্ধ ক'রে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকেন।

কিন্তু তবু শোনা যায়, নাকি স্বরে শিশুকণ্ঠের একটা ভয়ানক আবদার যেন নন্দাকে গ্রাস করার জন্য সিঁড়িকোঠা থেকে চিলকোঠা পর্যন্ত সন্ধান করে ফির্‌ছে।

অনেকক্ষণ পরে, দোতালার বারান্দায় একটা সোরগোল শুনতে পেয়ে ভাঁড়ার ঘরের গোপনতা থেকে বের হয়ে আসেন নন্দা।

জগৎবাবুর অফিসের দারোয়ান এসে হাঁকডাক করছে। কতগুলি জিনিসপত্র বারান্দার মেঝের ওপর রেখে দারোয়ান বলে বড়বাবু এই সব জিনিস আর এই চিট্‌ঠি ভেজিয়েছেন।

সাটিনের ছোট একটা কোট আর একটা প্যান্ট, এক শিশি লজেন্স, কতগুলি রঙীন পুতুল আর একটা ছবির বই। এই সব জিনিস, এবং তার সঙ্গে চিট্‌ঠি— 'আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। গোকুর সঙ্গে এই জিনিসগুলি দিয়ে দিও।'

তিন তলার সিঁড়ি ধরে তর্ তর্ ক'রে খরগোসের বাচ্চার মত লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসে গোকু এবং এসেই দু'হাত দিয়ে নন্দার একটা হাত ধরে ঝুলে পড়ে।—বড় মা!

গোকুও ক্লান্ত হয়েছে, তার আবেদনের ভাষাও ছোট হয়ে এসেছে। সব কথা যেন ঐ একটা কথার মধ্যে বলে দিতে চায় গোকুল—বড় মা!

নন্দা বলেন—ছিঃ, এরকম করতে নেই, গোকু। গোকু নাকি সুরে প্রতিশ্রুতি জানায়, লালুকে একটুও কাঁদাবে না, শুধু বড়মার বিছানার একপাশে শুয়ে থাক্‌বে।

গোকুর দু'হাতের বন্ধন থেকে নিজের হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিলেন নন্দা। তারপর অবিচলিত ভাবে বলেন—এই সব জিনিস তোমার জন্যে এসেছে গোকু। নিয়ে যাও।

গোকু নিষ্পলক ভাবে নন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নন্দা বলেন—নিয়ে যাও গোকু, কেমন সুন্দর লাল নীল সব জিনিস!

গোকু তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দা উৎসাহিতভাবে বলেন—এই সব তোমার জিনিস গোকু, রাখু বোঁচা মীনু কেউ কিছ্ছু পাবে না।

গোকু আবার জিনিসগুলির দিকে তাকায়। শিশুচক্ষের দুই চঞ্চল তারকা একটা রঙীন লোভের স্তূপের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুগ্ধ হয়েছে গোকু। নিশ্চিত হন নন্দা।

ওপরতলায় চলে গেলেন নন্দা এবং আরও নিশ্চিত হলেন তখন, যখন কান পেতেও আর শুনতে পেলেন না কোন নাকি সুরের আহ্বান। একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন, যখন আবার দোতালায় নেমে এসে দেখতে পেলেন, গোকু এক মনে রঙীন পুতুল আর ছবির বই নিয়ে খেলা করছে।

দুপুর হতে আর বড় বেশি বাকি নেই। হারাণ মাস্টারের আসবার সময় হয়ে এল। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনার রকমটাও উল্টে গেছে। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে নন্দা আবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

নতুন সমস্যা হলো, গোকু একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। ঘরের কোথায় কোন্ আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকছে গোকু, অনেক ডেকে ডেকে এবং খুঁজে খুজে বের করতে হচ্ছে গোকুকে।

ওপর-নীচ এবং এঘর-ওঘর অনেকক্ষণ ধ'রে সন্ধান করার পর নন্দা দেখতে পান, গোকু বসে আছে বারান্দায় থামের পাশে চুপ ক'রে। কখনও বা বাইরের ঘরে জগৎবাবুর টেবিলটার কাছে। কখনো দেখা যায়, দোতালার সিঁড়ির ধাপে, কিংবা একটা জানালার ওপরে উঠে বসে আছে গোকু। রাখু মীনু বোঁচা সবাই ঝি-এর সঙ্গে মামাবাড়ি বেড়াতে চলে গেল, চোখের সাম্‌নে এমন একটা ঘটনা দেখ্‌তে পেয়েও বিচলিত হলো না গোকু। ওর অন্তরাত্মা যেন এ বাড়ির জানালার গরাদ আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্য একটা সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে করে ফেলেছে।

স্নান করতে বলা মাত্র স্নান করলো গোকু, এবং খেতে বলা মাত্র খেয়ে নিল। গোকুর সত্তা থেকে যেন সব বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেছে। হাত-পা থেকে সব দুরন্তপনা পালিয়ে গেছে। চোখ থেকে সব কৌতূহলের উগ্রতা উবে গেছে এবং কণ্ঠস্বরে আবেদন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

তবে কি কিছু টের পেয়ে গেছে গোকু? সন্দেহ ক'রে মনে মনে আবার আতঙ্কিত হন নন্দা। আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকে কেন? এমন শান্ত হয়ে গেল কেন গোকু? দেখে মনে হয়, গোকু যেন এক অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশে এই প্রশ্ন নিবেদন করছে—আমি তো এখন আর কোন সমস্যা নই। আমি তো জোর ক'রে কোন দাবী আর করছি না। রাখু মীনু বোঁচার কাছ থেকে দূরে দূরেই সরে থাকছি। তবে আর আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য এত চেষ্টার দরকার কি?

কিন্তু এমন ক'রে ভাষা গুছিয়ে প্রশ্ন করবার শক্তি তো এইটুকু ছেলের থাকতে পারে না। নন্দা শুনছেন তাঁর নিজেরই মনের প্রশ্ন, এবং শুনেই চম্‌কে উঠছেন।

তবে কি চিঁড়িয়াখানা দেখতে চাইবে না গোকু? সত্যিই কি কিছু সন্দেহ করেছে? নইলে হঠাৎ এত সতর্ক হয়ে ওঠে কেন?

হারাণ মাস্টার এসে গেল। সমস্ত বাড়ীর মনটা যেন পাকা শিকারীর মত সতর্ক হয়ে ওঠে। গোকু যেন টের না পায়। নন্দা আবার হারাণকে জিজ্ঞাসা করলেন—আশ্রমে মারধর করে না তো, হারাণ?"

—আজ্ঞে না, কাকিমা! সুন্দর সুন্দর মাতুর বুনতে শেখায়।

নন্দা চুপ করে বসে রইলেন।

হারাণ প্রশ্ন করে—গোকু কোথায়?

নন্দা উত্তর দেন—পড়ার ঘরে গোকু ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোকুকে জাগিয়ে ওঠাবার জন্যে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো হারাণ মাস্টার।

নন্দার কি-রকম একটা আশঙ্কা ছিল. গোকু যেতে চাইবে না। বোধ হয় সব ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে গোকু। কিন্তু থেকেই বা কি হবে ওর? এই রক্ত মাংসের সূত্রে বাঁধা মায়া-মমতার ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে ছ'বছর বয়সের একটা বাইরের মানুষকে কেমন ক'রে ঠাঁই দেবে নন্দা? ছ'বছর দশ মাস আগেই আসা উচিত ছিল গোকুর; এখন আর উপায় নেই।

কেন উপায় নেই? একটা উল্টো প্রশ্ন যেন দূরের ঝড়ের শব্দের মত নন্দার কানের মধ্যে বাজতে আরম্ভ করে। ওলট-পালট হয়ে যায় মনের ভেতরটা। উপায় আছে বৈকি। বিনা বেদনায়, বিনা প্রসবে ও বিনা আঁতুড়ে একটা শিশু কোলের কাছে এসে গেছে, এ সত্য

উপায় হয়ে যায়, এবং আর কোনো
বাধা কোথায় ?

নন্দা—হারাণ, হারাণ। যেন আর
চায় না, নন্দাই বা গোকুকে যেতে
দিকে তাকিয়ে আরও জোরে
শুনে যাও, হারাণ।

টিপে টিপে তেতলা থেকে নেমে এসে হারাণ বলে—সব বুঝে ফেলেছে, কাকিমা ! এই দেখুন, পুঁটলি বেঁধে সব গুছিয়ে রেখেছে। একেবারে তৈরি হয়েই রয়েছে।

নন্দা দেখলেন, চীনেমাটির সিংহ, ছবির বই, সিগারেটের রাংতা, গণেশের ছবি, সব কিছু এক করে জড়ানো একটা পুঁটলি, ফিতে দিয়ে আলগা করে বাঁধা। ফিতের গেরোটা কেমন এলোমেলো, গোকুর ছোট হাতে এর চেয়ে বেশি বাঁধন দেবার দক্ষতা নেই, শক্তিও নেই বোধ হয়।

নন্দা হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন—যাও তোমরা, এবার সরে পড়, আর দেরি করো না।

গোকুর ঘুম ভাঙাবার জন্য তেতলার ঘরে আবার চলে গেল হারাণ মাস্টার। ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়ে নন্দা চুপ ক'রে
...ত পারলেন, সিঁড়ি ধরে তেতলা